নষ্ট কোষ্ঠী

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তৃতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর ১৯৬২

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মু

কোষ্ঠী হারানো সেই ছেলেটিকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার অন্যান্য বই

কখনও কাছে, কখনও দূরে

নিমিত্তমাত্র

মজার মামা

ষড়যন্ত্রের নায়ক

মনের মুখ

মধ্যে সমুদ্র

নষ্ট কোষ্ঠী

সক্কালবেলাই 'একচোখ দেখানো' নিয়ে খুড়ো ভাইপোয় হয়ে গেলো একচোট।

উঠোনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দাঁতন করছিলো পবন ঘোষাল। ভাইপো ষষ্ঠীচরণ ওরফে ফ্যালাকে সদ্য ঘুমভাঙা চোখের একটা চোখ কচলাতে কচলাতে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখেই খিঁচিয়ে উঠলো, হলো তো! আজকের দিনটার বারোটা বাজিয়ে দিলি তো? সক্কালবেলাই অযাত্রা! বলি—'একচোখ' দেখালি কেনরে লক্ষ্মীছাড়া পাজী। সক্কালবেলাই 'একচোখ' দেখালি কেন? অ্যাঁ?

'পাজী লক্ষ্মীছাড়া', ওটা কোনো ধর্তব্যের ব্যাপার নয়, পবন ঘোষালের ডাকের ভঙ্গীই ওই। নিজের ছেলেদের ডাকতেও ওই বিশেষণটি ব্যবহার করে থাকে। কাজেই ওটায় তেমন গুরুত্ব দেয় না ফ্যালা। সে মূল প্রশ্নটাকেই মূল ধরে বলে ওঠে, তো চোক চুলকালে চুলকোবুনি?

তো, এক চোক চুলকাবি কেন? অ্যাঁ? শতোবার বলি নাই, ঘুম ভাঙতে মাত্তরই যদি চোক চুলবুলিয়ে ওঠে, দুটাই একসাতে কচলাবি।

হ্যাঁ, বলেছে বটে খুড়ো একথা অনেকবার। কারণ সক্কালবেলা ঘুমভাঙা চোখ দুটো খুলবা মাত্রই ফ্যালার চোখেরা চুলবুলিয়ে ওঠে। কিন্তু একটা নেহাত তুচ্ছ নিষেধ-বাক্য কী সব সময় মনে থাকে? অগ্রাধিকার হিসেবেই হাতটা একটা চোখেই এসে পড়ে। তাছাড়া আজ এখন তো আবার ফ্যালার অন্য সমস্যা! রাতে ঘুমের সময় কখন 'হাফ পেন্টুলের' কোমরের শেষ বোতামটাও খুলে পড়ে গেছে। কাজেই পেন্টুলটাকে খসেপড়া থেকে রক্ষা করতে একখানা হাত 'জোড়া'!

অতএব খুড়োর কথা নস্যাৎ করে উত্তর দেয় ফ্যালা, হ্যাঁ। চোক-কান হঠাৎ চুলবুলিয়ে উটলে নোকে পাঁজিপুঁতি দেখে, 'পারমিট' পেলে তবে চুলকাতে বসবে!

ফ্যালার কথাবার্তাই এইরকম চোখা চোখা। এটাই দু'চক্ষের বিষ পবনের। অবশ্য 'বিষে'র কারণ আরো বিদ্যমান, তবে ছোঁড়ার ওই বাক্যিবুলি আরো বিষ করে তোলে।

দেখেছো! দেখেছো একবার লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার আসপদ্দার কথা!

বলে পবন ঘোষাল অনেক দফার পর আরো একদফা থুঃ থুঃ করে উঠোনের মাঝখানে থুতু ছিটোয়, মুখ থেকে নিমের ডালের টুকরোটা সরিয়ে। এটাই পবন ঘোষালের নিত্য নিয়ম। ভোর সকালে উঠেই একটুকরো নিমের ডাল নিয়ে সারা উঠোন ঘুরে ঘুরে দাঁতন করে। আর মাঝে মাঝেই উঠোনের যেখানে সেখানে থুতু ফেলে। বলতে পারা যায় এটাই পবন ঘোষালের প্রাত্যহিক ব্যায়াম, ও মানসিক আরাম।

সুষমা দেখতে পেলেই মুখ বাঁকিয়ে স্বগতোক্তি করে, নরক! নরক! শেষ রাত্তিরে উঠে ছড়াঝাঁট দে 'ছ্যান' করে আসবো, আর ফিরে নরক মাড়িয়ে মাড়িয়ে দাওয়ায় উঠবো! দাঁতন না মাতন!

তবে পবন ঘোষালের কানে ঢুকে পড়তে পারে, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে না অবশ্য। তেমন স্বরেও না। কানে ঢুকে পড়লে রক্ষে থাকবে?

কেন রক্ষে থাকবে না, 'কী' রক্ষে থাকবে না সেকথা জানে না এ বাড়ির বড় বৌ সুষমা। শুধু জানে 'রক্ষে থাকবে না'। কিন্তু শুধু বাড়ির বড় বৌটিই বা কেন, বাড়ির সব্বাই জানে বাড়ির ছোটকর্তা পবন ঘোষাল চটে গেলে কারুর রক্ষে থাকবে না। জানে, এবং তটস্থ হয়ে সেটা মানেও। সবাই ছোটকর্তাকে ভয় করে চলে। মা পিসি দাদা বৌদি যমজ ছোট বোন দুটো, এমন কী পবন ঘোষালের দ্বিতীয় পক্ষের বৌটাও। 'দ্বিতীয় পক্ষ' হওয়ার সুবাদে তার বাড়তি সোহাগের বালাইমাত্র নেই। আর তার নেঁড়িগেঁড়ি তিনটে। বাপকে তো বাঘের মতো ভয় করে। ওই খেঁকি খিট-

খিটে হাঁপানি রুগী লোকটাই যে এবাড়ির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তা বাড়ির কাজের লোক-টোকেরাও জেনে বুঝে বসে আছে।

বড়কর্তা ভুবন ঘোষাল কাউকে কোনো কাজে ডাকলে, তারা অনায়াসেই মুখের ওপর বলে যায়, "দাঁড়ান, আগে জেনে আসি ছোটবাবু ক্যানো ডাকতেচে!"...আবার দৈবাৎ কোনো ব্যাপারে ভুবন কাউকে কোনো নির্দেশ দিলে, সেও অনায়াসে বলে, "আপনি বললেই তো হবে না। ছোটবাবুর হুকুম চাই না? তেনার হুকুম হচ্ছে—"

ভুবন ঘোষাল ব্যস্ত হয়ে বলে, "তবে থাক! তবে থাক! ছোটবাবু যা বলেছে তাই কর।"

শুধু ওই ভাইপোটারই পবন ঘোষালের ওপর 'তেরিয়া' হয়ে উঠে কথা বলে বসবার সাহস। কচাকচ্ কাটানে কথা বলবার হিম্মত। কে জানে কোন বুকের বলে!

'ছোঁড়ার আসপদ্দা' শুনেই পবনের পিসি এদিকে চলে এসে বলে, তাই তো দেকচি। গুরুলঘু জ্ঞান নাই মুখপোড়ার।

পবন মুখ বাঁকিয়ে বলে ওঠে, থাকবে কোথা থেকে? ভেন্ন গোঠের গরু যে। বেগোড় ঝাড়ের তেউড় বাঁশ! ঝাড়ের বাঁশ হলে কী আর এমন হতো?

ফ্যালা জ্ঞানাবধিই এই কথাগুলো শুনে আসছে, ওই খুড়োর মুখে। খুড়ো তাকে ভেন্ন গোঠের গরু বলে, বেগোড় ঝাড়ের তেউড় বাঁশ বলে, আমবাগানের তেএঁটে তাল বলে, এমন আরো কত কী-ই যেন বলে খুড়ো। তা ফ্যালা এসব কথার মানেও বোঝে না, বোঝবার জন্যে মাথাও ঘামায় না। জানে খুড়োর মুখই অমনি। জানে ওসব হচ্ছে 'গালমন্দ'র একটা বিশেষ ভাষা!

নিজের পরিবারকেও তো খুড়ো বলে, 'লবাবনন্দিনী,' 'বাদশাজাদি', 'মহারানী'! ছেলেমেয়ে তিনটেকে বলে, 'আকালের মাকাল'! 'হাভাতের পুত!' ··মানে আছে এসবের?

তাই খুড়োর কথার মানে খোঁজবার চেষ্টা না করে ফ্যালা খুড়োর পিসিকে উদ্দেশ করেই বলে ওঠে, ওঃ। গুরুলঘু জ্ঞান নাই। যতো দোষ নন্দ ঘোষ এই ফ্যালা। তোমার ভাইপোটিরই

বা সে জ্ঞান কতো আচে? অ্যাঁ? তুমি ওনার গুরুজন না? ঠাক্‌মা ওনার গুরুজন না? ফ্যালার মা-বাপ? কাকে কতো মান্যি করচে উনি? তোমরাই ওনাকে মান্যি করে মরো! হ্যাঁ—

বলে ফ্যালা হাফপ্যান্টটার কোমরের গোড়াটা আর একটু বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

শুনে পবন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এও সম্ভব? তার মুখের সামনে এ হেন ভাষণ। তারপর গর্জন করে ওঠে, কী? ফের মুখে মুখে ফোঁস?···তা হবে না? হবে বৈকি। দুধকলা দিয়ে পোষা হচ্চে যখন।

বলেই হাতের নিমডালের টুকরোটায় শেষ কামড় বসিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে খিড়কির দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে যায় 'নোনাপুকুরের' দিকে।

ওই নোনাপুকুরই এখানকার আদি ও অকৃত্রিম! এই 'ময়নাপুর' গ্রামে। একদা নাকি পুকুরটার জল ছিলো নোনতা। গ্রামের লোক বলতো, "ভেতরে ভেতরে সমুদ্দুরের সঙ্গে যোগ আছে।"

কোন 'সমুদ্দুর', কতো যোজন দূরে সেই 'সমুদ্দুর', তা কে হিসেব রাখতে যাচ্ছে? জলটা যখন নোনতা, তখন সমুদ্দুরের সঙ্গে আছেই কিছু জ্ঞাতিত্ব!···'সমুদ্দুরের' সম্পর্কে ধারণা, এই ময়নাপুর গ্রামের লোকের কতোটাই বা স্পষ্ট! তবে ওই নোনাপুকুর নামটা নিয়ে কারো গবেষকী চিন্তাও নেই। তা ছাড়া এখন তো আর কেউ পুকুরের জল খায় না, খায় 'টিপকলের'! তাই জানা নেই জলটা এখনো নোনতা আছে কিনা।

খুড়ো চান করতে চলে যেতেই ফ্যালা লাফ মেরে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে কোণের দিকে টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা একহাতে ঘটঘট করে অন্যহাতে মুখচোখ ধুয়ে নিলো। এখন এটুকু সময় হাফপ্যান্টকে 'হাতে' রাখবার প্রশ্ন নেই। বসেছে হাঁটু উঁচু করে উবু হয়ে। খুড়োর মতো দাঁতন-টাতনেরও ধার ধারে না। এখানে সেখানে নোনাধরা দেয়ালেরা মাজনের জোগানদার। ছেলেপুলের ওটাই বরাদ্দ! দেয়ালের ইয়া একখানা ইঁটের খাঁজে আঙুলটা একটু ঠেকিয়ে নিয়ে দাঁতে ঠেকানোর ওয়াস্তা মাত্র! এ মাজন

হয়তো এ বাড়ি পুরুষানুক্রমেই সাপ্লাই করে চলেছে। কে জানে আরো কতো দিন চালাবে।

ফ্যালা এখন একটা বোতামযুক্ত হাফপ্যান্ট পরে নিয়ে, গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, আচ্ছা ঠাক্‌মা! তোমার ছোট ছেলেখানি আমায় এমন দু'চক্ষের বিষ দ্যাকে ক্যানো বলো তো? আমি ওনার কী পাকাধানে মই দিছি? অ্যাঁ?

লেখাপড়ায় তেমন ওস্তাদ নয় বলে যে কথায় কিছু কম ওস্তাদ ফ্যালা, তা নয়। গ্রামের ছেলে, বন্ধুসমাজ বেশীর ভাগই চাষীবাসী ঘরের। তাদের কথার ধরনে কথার চাষ।

ঠাকুমা একমনে সজনে ডাঁটা ছাড়াচ্ছিল, হাতের কাজ থামিয়ে বেজার মুখে বলে, তো সে কতা আমায় শুদোতে এয়েচিস ক্যানো? যে 'তা' দ্যাকে, তাকেই শুদোগে যা!

হিঃ! তা আর না! খেঁকি দুর্বাসা। শুদোলে আরা খেঁকিয়ে উটবে না? যাক গে, যার যেমন মতি। কী দেবে দ্যাওদিকিন। খিদায় পেটে আগুন জ্বলতেচে!

মরি! মরি। সাত সকালেই পেটে আগুন জ্বলে উটেচে? বলিহারি যাই। তো আমায় বলা কেন? নিজের মাকে বলগে যা না!

ফ্যালা হঠাৎ ফিক্‌ করে একটু হেসে ফেলে বলে, নিজের মায়ের থেকেও বাপের মা উঁচু নয় বুজি? তোমার 'এস্টকে'ই তো ভালো জিনিস-টিনিস।

কথাটা মিথ্যে নয়, নাড়ু মোয়া নারকেল পাটালি তিলচাক্তি এইসব দ্রব্যসম্ভার ফ্যালার ঠাকুমা নিজের হেফাজতে রাখে। বৌদের হাতে পড়লে রক্ষে আছে? সোহাগের ছেলেমেয়েদের বেশী বেশী খাইয়ে দুদিনে ফর্সা করে দেবে না? বৌয়ের হাতে শুধু মুড়ি-মুড়কি আর ছোলোসেদ্ধ! নিজেদের চাষের ছোলা, কতো খাবে খাও মুঠো মুঠো!

ফ্যালার কথা কানে যেতেই ফ্যালার মা সুষমা একটা ছোট

ধামায় মুড়ি-মুড়কি আর তার ওপর এক গামলা ছোলাসেদ্ধ বসিয়ে নিয়ে এসে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, ঠাকমাকে ব্যস্ত করছিস কেন ? পিসিরা, ভাইবোনেরা যখন খাবে, তখন খাবি তো ?

ওঃ ! পিসিরা ! তাদের তো চুল আঁচড়াতেই একঘণ্টা কেটে যাবে। আর ভাইবোনেরা ? ঘণ্টু, পেণ্টু, শিবি ? তাদের তো ভোর সকালেই একপালা ঝোলা গুড় দে বাসি রুটি সাঁটা হয়ে গেছে।

মা রেগে ওঠে, শোনো কথা ছেলের। একথা আবার তোরে কে বলতে এলো ?

ফ্যালাকে কারুর কিছু বলতে হয় না। ফ্যালা নিজে নিজেই সব বুজে নেয়। খুড়ো তো স্যাকরা জ্যেঠুর দোকান থেকে তাস খেলে রাত দুকুরে বাড়ি ফেরে। অর্ধেক দিনই খায় না। বলে, 'আড্ডায় মুড়ি তেলেভাজার খ্যাঁট হয়েচে, আর খাওয়া চলবে না।' আর বেশী দিনই দুখান খায় তো দশখান ফেলে রাকে। সেই গুলান ওরা ভোর সকালে চুপিচাপি সাঁটে।

ফ্যালার বাবার পিসি মুখ ঝামটায়, ওমা ! এ ছোঁড়ার কটকটে কতা শোনো ! খায় যদি তো চুপিচাপি কেন ? ওরা কি চোর-ছ্যাঁচোড় ? বানের জলে ভেসে এয়েচে ? খেলে হক-এর খাওয়াই খাবে। তোর এতো হিংসে ক্যানো রে ?

ফ্যালা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। বলে, হিনসে করতে আমার দায় পড়েচে। তবে এইটাই বুজিনে, সব্বাইয়ের হক আচে, ফ্যালারই ক্যানো নাই। সকল সময় দেখি ফ্যালাই যেন বানের জলে ভেসে এয়েচে! ফ্যালার বাবা অধিক রোজগার করতে পারে না বলে বুজি ?

বাপের পিসি বাপের মা দুজনে একই সঙ্গে গালে হাত দেয়। বলে ওঠে, ওমা, মা। এইটুকু ছেলে কী এঁচড়ে পাকা গো ? এতো কূটকচালে বুদ্ধি ! সাধে আর পবনা বলে "বেগোড় ঝাড়ের তেউড় বাঁশ !"

সুষমা ঈষৎ কঠোর গলায় বলে, ফ্যালা ! দালানে গিয়ে বাটি নিয়ে বোসগে যা ! খিদের সময় খেতে এয়েচে ছেলেটা, তাকে

গর্চ্ছির ছাইভস্ম কতা বলা।

শেষের কথাগুলো অভিমানে ভারাক্রান্ত।

তবে গিন্নীযুগল তাতে টলে না। বলে ওঠে, ছেলেটিও তো তোমার কম না বোমা? ওইটুকুন ছেলের মুকের বাক্যি কী তা দেকেচো?

সুষমা স্থিরভাবে বলে, অবিরত খোঁচা খেলে কুয়োর ব্যাঙও লাফিয়ে ওঠে পিসিমা!

তারপর বাইরে এসে ছেলেকে একধামি মুড়ি-মুড়কি আর একথাবা ছোলাসেদ্ধ দিয়ে বলে, এই খেয়েই এখন ইস্কুলে যা বাবা! এখন আর নাড়ু বড়া তিলমোয়ার বায়না করিস না। দুপুরে ভাতের সময় তোর মৌরলার টক পাবি।

মৌরলা মাছের ইতিহাস এই, গতকাল বিকেলের দিকে ফ্যালা কীভাবে যেন গামছা ছাঁকা দিয়ে চারটি মৌরলা মাছ ধরে এনে বায়না করেছিলো, এক্ষুনি ভেজে দাও। মা নিবৃত্ত করেছিলো, কাল কাঁচা আম দিয়ে টক রেঁধে দেবো বলে।

মৌরলার টকের নাম শুনে ফ্যালা ঈষৎ হৃষ্টচিত্তে মাতৃদত্ত ব্রেক-ফাস্ট সেরে ইস্কুলে যাবার তোড়জোড় করে। এখন গরমকাল, মর্নিং স্কুল চলছে। ইস্কুল যেতে ফ্যালা আর পিসি দুটো। ফ্যালার থেকে বছর দুইয়ের বড় ওরা। যদিও তাদের মায়ের অর্থাৎ ফ্যালার ঠাকুমার মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়া দুচক্ষের বিষ। বুড়ো বয়েসে 'ধেড়েরোগ' বলে অভিহিত এই একসঙ্গে জন্মানো একজোড়া মেয়েকে তিনি প্রায় শত্রুতূল্য দেখেন। তবে কী জানি কেন বড়ছেলের একমাত্র ছেলেটা ওই ফ্যালাও তাদেরই সমগোত্র হয়ে গেছে।

ফ্যালার আজ কপাল মন্দ, তাই ইস্কুল যাবার মুখে খুড়ো ঘাট থেকে ফিরলো পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে শামুকে পা কেটে। ওরে বাবারে—পাখানা একেবারে ফালাকাটা হয়ে গেছে রে। রক্তে বান ডেকেছে।...হবে না? সক্কালবেলাই অযাত্রা। তখনি বুঝে-ছিলুম হবে আজ একখানা কিছু!...ওই 'কাল' যখন সক্কালবেলা একচোখ দেখিয়েছে—

মা পিসি দুজনে 'আহা আহা' করে ছুটে আসে, শামুককাটা

ক্ষতের প্রতিবিধান কল্পে। পিসি বলে, ত্যাখনি পুকুরের পানা তুলে চাপা দিলিনি ক্যানো বাবা? রক্তটা বন্ধো হতো।···মা তাড়াতাড়ি পানে খাবার চুন আর আখের গুড় ফেটিয়ে নিয়ে কাটা জায়গায় প্রলেপ মারে। সিমেন্টের মতন সেঁটে যাবে। রক্তর বাবার সাধ্যি নেই সেই দুর্ভেদ্য আগল ভেদ করে উঁকি মারতে পারে।

পবনের দ্বিতীয়পক্ষ সরসী ভয়ে কাঁটা হয়ে ছেলেমেয়ে তিনটেকে ঢেঁকিঘরের ধারে নিয়ে গিয়ে 'গেরস্থর বরাদ্দ' প্রাতঃরাশটি দিয়ে বসিয়ে আসে! ···হ্যাঁ, বাসি রুটির কারসাজি তার আছে বটে। হাঁপানি রুগী পবনের গলায় ঝোলানো মাদুলিটার নির্দেশে সূর্যাস্তের পর ভাত খাওয়া নিষেধ। অথচ সে তার পঞ্চায়েত অফিসের কাজটা সেরেই তাসের আড্ডায় গিয়ে ভেড়ে। কাজেই তার জন্যে 'স্পেশাল' ব্যবস্থা রুটি। তা নইলে রুটি আবার কে কবে করতে গেছে এ সংসারে? তেমন ভাল বানাতে পারেই বা কে? তো সরসী টাউনের মেয়ে, রুটি বানাবার হাত আছে তার। তাই তার ওপরই ভার। তো সরসী যদি তার পতিদেবতার ভোগের ব্যবস্থার সঙ্গে অপগণ্ড পুত্র-কন্যা তিনটের জন্যে কিছুটা বাড়তি ভোগ বানায়, এমন আর কি আশ্চয্যি। দেবতার নৈবিদ্যি সাজাতেও তো 'কুচো নৈবিদ্যি'র ব্যবস্থা থাকে।

বেচারী এটুকু না করেই বা করে কী? 'ব্রেকফাস্টের' উপকরণ সমূহ তো গিন্নীদের কব্জার মধ্যে। তাঁরা যতোক্ষণ না স্নানশুদ্ধ হয়ে ভাঁড়ারে হাত দিচ্ছেন, ততোক্ষণ তো সে বস্তু আর পাবার উপায় নেই!

এদিকে আগের রাতে 'সন্ধ্যের আগেই কুচোকাঁচা'দের 'ল্যাঠা মিটিয়ে ফেলার' জন্যে তাদেরকে দুপুরের রাঁধা ভাত ডাল তরকারি দিয়ে সেরে দিয়ে ঝামেলা চুকনো হয়ে থাকে। কাজেই ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই তাদের পেটের মধ্যে রাবণের চুল্লী জ্বলে ওঠে।···প্রথম প্রথম সরসী ফ্যালাকেও ডেকেছে চুপিচুপি, কিন্তু ফ্যালা হ্যাঁজ করে বলেছে, "ধুস। বাসি রুটি আবার মানুষে খায়! রুটিই আমার দু'চক্ষের বিষ!"

বার তিনেক ভাত খায় ফ্যালা। সেই খাওয়ায় ফ্যালার সঙ্গী.

ওই পিসি যুগল। 'ক্ষেন্তি' আর 'ইতি'। হয়তো ওই 'ক্ষেন্তি', 'ইতি' নামের তুকতাকেই তাদের মা অতঃপর আসান পেয়েছিলো।… তারপর তো বিধাতাই 'আসান' দিয়ে দিলো। ক্ষেন্তি ইতি এবং তৎপূর্বের বীণা মিনা স্বপ্না শান্তি আর পবন ভুবনের আটচল্লিশ বছরের মা বিমলাবালা, আবাল্য বিধবা ঘরে থাকা সমবয়সী ননদ তরঙ্গিণীর হবিষ্যির হেঁশেলে ভর্তি হয়ে গেলো।

বাড়লো শুচিবাই। আর সেই বাবদ শুচিতায় ননদের ওপর টেক্কা মারামারি। অসহায় যমজ মেয়ে দুটোর ভার বড়বৌ সুষমার ওপরই বর্তালো।…তো তার তো তখন কোলে কাঁচ।…'হবে না হবে না' করে প্রায় 'বাঁজা' নাম কিনে ফেলে, বিয়ের বারো বছর পরে কোলে ছেলে এসেছিলো। বিয়েটা যে মাত্র তেরো বছর বয়সে হয়েছিলো সে খেয়াল কেউ রাখেনি। প্রায় দেগেই দিয়েছিলো বাঁজা বলে। তথাপি মাদুলি কবচ তিলবাঁধা…ষষ্ঠিতলায় ধর্না দেওয়া চলছিলোও সমান তালে। ভালোবেসে, আবার জেদেও।

বিমলাবালারও তো কম আক্রোশ ছিলো না ছেলের বৌয়ের ওপর! ছেলের বৌ বিয়ের পর এক যুগ ধরে ন্যাড়া কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তিনি তার সামনে একজোড়া মেয়ে নিয়ে আঁতুড়ঘর থেকে বেরুলেন, এটা কী কম লজ্জার কথা? এতো লজ্জার হতো না যদি বৌ ইত্যবসরে দু'একবার আঁতুড়ঘর ঘুরে নিতো।…এ যেন শাশুড়ীকে লজ্জায় ফেলারই চক্রান্ত।…তাই মরিয়া হয়েই বিমলা বৌয়ের জন্যে রাজ্যি তোলপাড় করেছে। অতঃপর ওই ফ্যালা।

কিন্তু এতো মাথা খুঁড়ে, ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে পাওয়া ছেলে, তার নাম 'ফ্যালা' কেন? সাতরাজার ধন এক 'মানিক' নয় কেন? আর তার সম্পর্কে ব্যবহারই বা এমন ফ্যালা-ছড়া ভাব কেন?

সেইটেই রহস্য।

এঁচড়ে পাকা ছেলেটার কথাই কী তাহলে ঠিক না কী?

ফ্যালার বাবা ভুবন ঘোষাল। গ্রামের ওই সবেধন নীলমণি 'দ্বারুকেশ্বর স্মৃতি বিদ্যালয়'-এর মাস্টার। মাইনে যে বেশ জোরালো তা তো আর হতে পারে না।…দ্বারুকেশ্বর ভট্টাচার্যর লিখে রেখে যাওয়া দেবত্র জমি থেকে গ্রামের 'সর্বকালীর' মন্দিরের

দৈনিক পুজোটা আর এই স্মৃতি ইস্কুলটা চলে।

অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে—সরকার নাকি ইস্কুলটা অধিগ্রহণ করবে, এবং উন্নয়ন করবে। তো ওই শুনতে পাওয়া পর্যন্তই। অবস্থা এখনো পূর্ববৎ।...এই ইস্কুলেই ফ্যালা পড়ে, এবং ক্ষেন্তি আর ইতিও পড়ে। কারণ এই 'ময়নাপুর' গ্রামে 'মেয়ে-ইস্কুল' নেই। অথচ ওদের এবং গ্রামের ওদের মতো কটা মেয়ের অদম্য বাসনায়ই স্কুলে মেয়েদেরও প্রবেশাধিকার ঘটেছে।

তবে সে ঘটনা আর কতদিন ঘটে চলবে? স্কুলতো আর 'হাই-ইস্কুল' নয়। পাঁচটা ক্লাশের পড়া পর্যন্ত ছিলো। এখন পঞ্চায়েতকে ধরাধরি করে আর দুটো ক্লাস বেড়েছে!

ক্ষেন্তি-ইতির তো সামনের বছরেই হবে ক্ষান্তি ইতি।

ফ্যালার অবশ্য আর দুটো বছর মেয়াদ আছে। তবে—ততোদিন যদি সরকার 'অধিগ্রহণ করে।' অধিগ্রহণ করলে না কী ইস্কুলবাড়ির মাথার টিনের শেড-এর বদলে পাকা ছাত হবে, 'কেলাশরুমে' মাদুর পাততাড়ির বদলে বেঞ্চি-টেবিল হবে। আর ইস্কুলে দশ কেলাস অবধি পড়ানোর ব্যবস্থা হবে!

ক্ষেন্তি ইতি শুনে শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বেল পাকলে কাগের কী?" তখন কী আর মা পিসি আমাদের ইস্কুল যেতে অ্যালাউ করবে।

তা সেটা সত্যি! পনেরো-ষোলো বছরের ধাড়ি মেয়েদের ইস্কুল যাওয়া অ্যালাউ করবে না মা পিসি। এখনই যে করছে, সেটা নেহাৎ ভুবন ঘোষাল ইস্কুলের 'হেডমাস্টার-মশাই' বলে। অবিশ্যি হেড বললে হেড। না হলে সর্বঘটে কাঁঠালি কলা।

পবনের শামুক-পর্বের জের মেটার পর, ভাইপো আর পিসিরা যখন ইস্কুলের পথ ধরলো, তখন রোদ চড়চড়ে। অন্যদিন এই মর্নিং-ইস্কুলের সুযোগে—ভোরে বেরিয়ে—ইস্কুলে যাবার পথে চাঁপাফুল পাড়া হয়, ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে জামরুল পাড়া হয়, এবং পিসিদের পরদিন ভোরের 'পুণ্যি-পুকুর ব্রতর' জন্যে কচি বেলপাতাও পাড়া হয়।

হ্যাঁ, এই ময়নাপুর গ্রামে এখনো এসব আছে। 'পুণ্যিপুকুর

হরিরচরণ !'

তো আজ আর সেসবের সময় নেই।

তবু পথে যেতে যেতে—পা চালাতে চালাতেও—কথা চলে।

ফ্যালা বলে, আচ্ছা পিসি, আমি তো মা-বাপের একটা মাত্তর ছেলে তবু ঠাকমা পিসঠাকমা আমায় অমন হ্যানস্থার চোক্ষে দেখে কেন বলতে পারিস ? খুড়ো তো—উকুন হলে টিপে মারত।

পিসি যুগল একবার কেমন যেন ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর বলে, ছোড়দার তো স্বভাবই ওই। আর মা পিসি ? কাকেই বা ধন্যিমান্যি করে। আমাদের দুজনাকেও তো উটতে বসতে গঞ্জনা। যেন আমরা ভেন্নস্থান থেকে সেধে এসে ওনাদের ঘরে ঢুকে পড়েচি।

ফ্যালা বিজ্ঞভাবে বলে, সে হয়তো 'মেয়ে' বলে। পয়সা খরচা করে বে দিতে হবে বলে। কিন্তু আমার বেলায় তো সে কতা খাটে না।

ওরা আবার পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করে বলে সেও ওদের ধাত !

তা ক্যানো ? ঘণ্টু পেণ্টুদের সঙ্গে ব্যাভারে তো মধু ঝরে।... ভাবিসনি আমি ওদের হিংসে করি। ওদের তো প্রাণতুল্যই দেকি। কিন্তু কেমন যেন রহস্য লাগে। বাবার রোজগার কম বলে ?

ইতি ক্ষেন্তি যেন অকূলে একটু কূল পায়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তাই হবে ! এই পৃথিবীটাই তো স্বার্থেয় ভরা ! টাকাই সব।

আলোচনায় ছেদ পড়ে।

'দ্বারুকেশ্বর স্মৃতি বিদ্যালয়-এর দরজায় এসে পৌঁছোনো হয়ে গেছে।

হেডমাস্টারমশাই কড়াচোখে তাকিয়ে বললেন, এতো দেরি যে তোদের ? আসার পথে গাছ ঠেঙানো হচ্ছিল বোধহয় ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি বলে, বাঃ গাছ ঠ্যাঙানো কী, ছোড়দার এক কাণ্ড না ?

তোদের ছোড়দার তো রোজই এক এক কাণ্ড। আজ আবার কী ?

শামুকে পা কেটে ইয়া ফালা। রক্তগঙ্গা। উঃ কী রক্ত! কী রক্ত।

আপাততঃ 'রক্ত'ই তাদের রক্ষাকর্তা। তাই 'কী রক্ত'র ওপর অতোটি গুরুত্ব আরোপ।...

ওদের দাদা অবশ্য ছোড়দার মতো অমন খেঁকি নয়, তবে—বেশ রাশভারী। ভয় করতেই হয়। তাছাড়া ওরা তো জন্ম-অপরাধী। জন্মে ফেলাই যাদের পক্ষে একটা গর্হিত অপরাধ, ভয়ই তো তাদের সম্বল।

ভুবন স্বভাবগত ভারী গলায় বললো, সেরেছে! তো রক্ত বন্ধ হয়নি?

এ সময় ফ্যালা ফট করে মুখ খোলে। বলে ওঠে—তা হয়েচে। বন্ধ না করে ছাড়বে ঠ্যাক্‌মা? চুনবালি দে একেবারে সিমেন্ট করে দেচে!

চুনবালি!

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি বলে, না না চুন-হলুদ।

চুন-হলুদ! কাটার মুখে? কী বলছিস যা-তা!

ইতি ইতি টানে—বলে, নাগো দাদা, চুন আর গুড়! ওতে না কি বিষ কাটে, কাটা মুখ জম্পেস বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক আছে।

বলে দাদা নিজের কাজে লেগে যায়।

ফ্যালা বাপ চোখের আড়াল হতেই 'যাই একটু জল খেয়ে আসি' বলে ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে উঠোনে নেমে টিউবওয়েল ঘটঘটিয়ে জল খেতে যায়। এটি তার একটি প্রিয় কাজ। এখানের টিউবওয়েলটায় জল বেশ মোটা ধারায়। বেশ লাগে ফ্যালার। একহাতে ঘটঘটায়, আবার অন্যহাতে জলের মুখ চেপে ধরে উঁচুদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে।' জলের সেই ধারায় রোদ পড়ে রামধনু রং-এর আভাস মেলে। এটা একটা মজার খেলা।

লেখাপড়ায় যে ফ্যালার মাথা নেই তা নয়, নেই 'মন'। ইচ্ছে করলেই ভাল করতে পারে। সেই ইচ্ছাটাই করে না।

মা যখন সকলের আড়ালে খোশামোদ করে, কেন মন দিস না

বাবা ? বড় হবি, বি. এ, এম. এ পাশ করবি—দশজনের একজন হবি, এ সাধ হয় না ?

ফ্যালা অনায়াসে বলে, হয়ে কী হবে ? শেষমেষ তো 'সার্টিফিকেটে' নাম উটবে 'ষষ্ঠিচরণ ঘোষাল'। হ্যাৎ। ওই নাম নিয়ে আবার বি. এ, এম. এ ! আর বড় হওয়া।

শোনো কতা। নামের সঙ্গে আবার পাশ-এর কী রে ? কতো জনার কতো রকম নাম হয়।

তা হোক ! তা বলে একটা মাত্তর ছেলের জন্যে একখানা মনিষ্যির মতন নাম জোটে নাই। যেমন না ডাকনাম, তেমনি না পোশাকি নাম ! হ্যাৎ !

মা তাড়াতাড়ি দু'হাত কপালে জোড় করে বলে, অমন কথা বলিস না বাবা। মা ষষ্ঠীর দান। দয়া করে কোলে ফেলে দিয়েছেন।

তোমার ওই এক কতা। মা ষষ্ঠীই তো সব ছেলেপেলেকে দেয়। এই ঘণ্টু পেণ্টু শিবি ওদের দেয় নাই। একুশখানা চুপড়ি সাজিয়ে সাজিয়ে মা ষষ্ঠীর পুজো হয় নাই ওদের জন্যে ?

তা তো হতেই হয়।

তবে ? ঘণ্টুর নাম মোহনকুমার, পেণ্টুর নাম শোভনকুমার রাকা হয় নাই ?

সে ওর মায়ের যা পছন্দ !

সেই তো। সেই কতাই তো বলচি। ছোট খুড়ির তো ওই বুদ্ধির ছিরি। তবু অমন ভালো ভালো নাম মনে এলো। আর তোমার এতো বুদ্ধি তবু—

মা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, চুপ চুপ ! তোর কী কোনোকালে কথায় আব্যি হবে না রে ? এ ছেলেকে নিয়ে যে আমি কী করবো গো···বলেই হঠাৎ একটু রহস্যমাখা হাসি হেসে বলে, তা তুই তো আর সত্যি আমার ছেলে নয়। তোর মা তো তোকে ফেলে দিয়ে চলে গেছলো। তাই নাম 'ফ্যালা'। আর মা ষষ্ঠীর দয়ায় আমি পেয়ে গেলুম বলে—'ষষ্ঠিচরণ' !

ফ্যালা রাগের গলায় বলে, চেরটাকাল তোমার ওই একই ঠাট্টা।

ভাল্লাগে না বাবা। ওটা এবার ছাড়ো তো। তোমাদের ওই পচা পুরনো একখানা ঠাট্টার জ্বালায় আমারে সবাই ক্ষ্যাপায়। নন্দ পাজীটা আবার বলে, 'ফ্যালা! ফ্যালা! মাটির ঢ্যালা!' ঠাট্টার আর কতা খুঁজে পায় না সবাই।

হ্যাঁ, সত্যি! এ সংসারে এইরকম একটা ঠাট্টা চালু আছে বটে বরাবর। কবে কে যে এটি প্রথমত বলে বসেছিলো ভগবান জানেন। তবে তাই থেকেই বোধহয় সবাই ওই ঠাট্টাটাই চালু করে। মাঝে মাঝেই তার উল্লেখ। তা ফ্যালা তো আর সেই ঠাট্টা মশকরার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। এমন বোকাহাবা ছেলে সে নয়। · কেউ অমন কথাটা উল্লেখ করলেই বলে ওঠে, "তোমারেও তো জঙ্গল থেকে কুইড়ে আনা হয়েচে! ··তোমারেও তো নোনাপুকুরের পচাপানার তলা থেকে আনা হয়েচে!"

তবে মা দৈবাৎ বলে বসলে হাসে। বলে, "তুমি বুজি ভিকিরি? তাই অন্যের ফেলে দেওয়া দ্রব্য কুইড়ে নে এয়েচো?"

আজ হাসে না। আজ রেগে গিয়ে বলে, ফেরাদিন ওই এক পচা ঠাট্টা-মশকরা। ভাল্লাগে না বাবা। ওটা এবার ছাড়ো তো!

তা সবাই কিছু সবসময় আর সে ঠাট্টা করছে না। তবে ফ্যালা মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে ভাবে, এ সংসারে তার যেন তেমন কোনো দাম নেই। প্রায় ওই পিসি জোড়াটার মতোই যেন "জন্মে পড়েছো, কী আর করা। থাকো খাও, ব্যস।" অথচ খুড়োর ছেলে দুটো? ঘণ্টু আর পেণ্টু! ওরা যেন ঠাক্‌মার নয়নের মণি।·· আচ্ছা— ফ্যালার বাবা, ঠাক্‌মার সতাতো ছেলে নয় তো? মানে ঠাক্‌মা ফ্যালার বাবার সৎমা নয় তো? মাঝে মাঝে এমন সন্দেহও মনের মধ্যে উঁকি দেয় ফ্যালার। বাবারও যেন তেমন দাম নাই! ফ্যালা জানে না মানুষের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মূলে থাকে জন্মনক্ষত্রের কারসাজি! সেই সূত্রেই তাদের স্বভাবটাও গড়ে ওঠে।

কেউ যেন স্বভাবতই ধরে নেয়, সংসারে প্রাধান্যই তার জন্মগত অধিকার। সংসারসুদ্ধু সবাই তাকে ভয় করবে মেনে চলবে। এটাই স্বাভাবিক। আর সংসারের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে বিশেষ একটি পাওনার দাবি আছে তার এও অবধারিত! কেন

এমন হয় তার কারণ কারো জানা নেই। যেমন জানা নেই—আবার হয়তো সেই একই সংসারের কিছু কিছু জন ভাবে, তার যেন কোনো দাবিদাওয়া নেই। অন্যদের সন্তুষ্ট রেখে চলার চেষ্টাটাই তার 'অবশ্য কর্তব্য'! একটু মান-সম্মান পেলে, 'বাড়তি কিছু পাওয়া হয়ে যাচ্ছে' ভেবে অস্বস্তিই বোধ করে।

তো ফ্যালার ঠাকুমার দুটো ছেলে এই দু'রকম।

ভুবন ঘোষাল যেন ধরেই নিয়েছে, পবনই সব। পবনের ওপর কথা চলে না। পবনের ইচ্ছে অনিচ্ছে আদেশ নির্দেশই সকলের শিরোধার্য। ভুবন সেখানে ফালতু মাত্র।

ফ্যালার জ্ঞান চৈতন্যর জগৎ যতই উন্মোচিত হয়ে চলেছে, ফ্যালা এইটা বুঝে ফেলতে শিখেছে। বাবা রাশভারী লোক, বাবার কাছে ফ্যালার কোনো প্রশ্রয় নেই, তবু ফ্যালা দেখে বুঝে অপমানাহত হয়। সংসারে খুড়োকেই সর্বেসর্বা দেখে। বাবা যদি ফ্যালার কাছে আর ফ্যালার মায়ের কাছে রাশভারী তো অন্যের কাছে যেন মুখচোরা অপরাধী!

আর ফ্যালার মা?

তার কথা বলে আর কাজ নাই। গুষ্টিসুদ্ধ সকলের তোয়াজ করে চলাই যেন ফ্যালার মার ধ্যান জ্ঞান।

ধুস! মা-টা না একটা বোকা! অন্য দিকে কতো বুদ্ধি! আর সবাই যে সব কাজ না পেরে ওঠে, মা কতো সহজে পেরে যায়। এ বাড়িতে গিন্নীরা কেউ বই পড়তে পারে না, মা পারে, তবু মা বোকাই। সব সময় অমন 'দোষ করেছি দোষ করেছি' ভাব কেন রে বাবা? খুড়ির মতো একটা বাপের বাড়িও তো নাই মায়ের, যে সেখানে দু'দিন গিয়ে আরাম করবে। মায়ের মা বাপ ভাই-বোন কেউ নাই! একটা নাকি পিসি ছিলো, সেই মাকে মানুষ করেছিলো। তারপর বে দিয়ে খালাস। আর সন্ধান নাই। মরেই গেছে হয়তো বা।

ফ্যালা যখন বড় হবে, অনেক অনেক টাকা রোজগার করে মাকে একদম মহারানীর মতো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে। মাকে কিছুটি কাজ করতে দেবে না। কাজ করবার লোক রাখবে। বাবাকেও আর

ওই পচা ইস্কুলে মাস্টারী করতে দেবে না ফ্যালা। মস্ত একখানা আড়ত করে দেবে বাবাকে, বাবা 'আড়তদার মশাই' হয়ে বসে থাকবে!...কিসের আড়ত তা অবশ্য জানে না ফ্যালা। তবে আড়তদার মশাই যে একটা মান্যের পোস্ট তা জানে।...

আর বড় হয়ে— অনেক বড় হয়ে গাদা গাদা টাকা নিয়ে হেলাভরে ঠাক্‌মা আর পিস ঠাক্‌মাকে দেবে আর বলবে, "নাও না যতো খুশী! আরো চাইলে আরো দেবো!..."

তখন দেখা যাবে ওই বুড়ি দু'জনার মুখের ভাবটি কেমন হয়? তখন হয়তো ওরা মাকে 'বৌমা বৌমা' করে খুব আদর দেখাবে, বাবাকে খুড়োর থেকে বেশী করে 'ভুবোন ভুবোন' করবে! আর ফ্যালাকে হয়তো অবহেলা করে 'ফ্যালা ফ্যালা' না করে 'বাবা ফেলু' বলবে! এই রমণীয় আর স্বর্গীয় ছবিটি ভাবতে ভাবতে ফ্যালা নিজের মনেই একচোট হেসে নেয়!...এঁচড়ে পাকা ফ্যালা জেনে গিয়েছে, বা ধরে নিয়েছে, ফ্যালাকে আর তার মা-বাপকে তেমন 'গ্রাহ্যি' না করার কারণটি হচ্ছে—বাবার কম টাকা থাকা!

ফ্যালা এ কথা চিন্তায় সুখ পায় না যে, সে লেখাপড়ায় উন্নতি করে অনেক বড় চাকরি করে বড়লোক হবে! দূর, ওতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগে। ফ্যালা চটপট বড় হয়ে উঠে, অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঝটপট বড়লোক হয়ে উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার স্বপ্নে সুখ পায়।

স্বপ্নের পরিধি বাড়িয়েও চলে ফ্যালা।

পিসি দুটোর বিয়ের সময় ফ্যালা ওদের জন্যে অনেক গহনা কাপড় কিনে দেবে।...অনেক ঘটা করতে বলবে খুড়োকে। বলবে, "টাকার জন্যে ভাবতে হবে না—সব ফ্যালা দেবে। লাগিয়ে দাও ঘটাপটা!..."

ফ্যালা এমন কি তার বন্ধুদের কথাও ভাবে। যার যা ইচ্ছে অভাব সব পূরণ করে দেবে ফ্যালা! এমন কী পাজী নন্দটাকেও দেবে অনেক কিছু। প্রতিশোধ নেওয়ারও এই একটা পথ আবিষ্কার করেছে ফ্যালা। নইলে খুড়োর জন্যেও 'হাতঘড়ি' বরাদ্দ হয়? বরাদ্দ হয় শীতের জন্য ভালো সোয়েটার কোট। বলবে পরে

আফসে যেও। দেখে মোহিত হয়ে যাবে খুড়ো। তখন আর হ্যানস্থা করতে আসুক দিকি ফ্যালাকে।

স্বপ্নের তো আর গাছ-পাথর থাকে না, তাই তার মধ্যে কালের ছোঁওয়া লাগে না। ফ্যালা তেমন বড়লোক হয়ে ওঠার কাল পর্যন্ত পিসিদের বিয়ে বাকি থাকবে কিনা, ফ্যালার বন্ধুরা ঠিক এই মূর্তিতেই ঘুরে বেড়াবে কিনা, ইচ্ছাপূরণের আহ্লাদে ডগমগ খাবে কিনা এবং খুড়ো তখনো ওই তার পঞ্চায়েত আপিসে যাওয়া আসা করবে কি না, এতো সব ভাবে না ফ্যালা। ফ্যালা শুধু অধীর আগ্রহে স্বপ্ন দেখে চলে বড়লোক হয়ে যাওয়ার!

আচ্ছা, ফ্যালা কি সেকালের মুনি-ঋষিদের মতো তপস্যা করবে? সারারাত ধরে ভীষণ তপস্যা দিনের বেলায় তো চলবে না, সব্বাইয়ের চোখে পড়ে যাবে। তপস্যা করতে হয় নির্জনে। সকলের চোখের আড়ালে। তো রাত্তির ছাড়া তেমন পরিবেশ সৃষ্টি হবার উপায় কোথায়? রাত্তির জেগে জেগেই তপস্যা চালাতে হবে। আর তপস্যা করে করে হদ্দ হয়ে যাবার পর ভগবান যখন বর দিতে আসবেন তখন ফ্যালা বলবে, "স্বর্গ টর্গ কিছু চাইনা ঠাকুর ভগবান! তুমি শুধু আমায় অনে-ক বড়লোক করে দাও। অনেক টাকাওলা বড়লোক। অফুরন্ত টাকা। যতো পারবো সব্বাইকে দেবো, তবু ফুরোবে না।"

বরপ্রাপ্তি তো হবে, কিন্তু তপস্যাটি চালাবে কোথায় বসে? রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে 'বিশ্বাসদের পোড়ো শিবমন্দিরটার মধ্যে গিয়ে?'

ওরে বাবা। ওখানে না কী সাপের আড়া।

ময়নাপুরের ওপারে—'ভূতির চরের' শ্মশানে? শ্মশানে-টশানেই নাকি তপস্যা করতে হয়। বাবাঃ। সেখানে তো রাত্তিরে ভূত-পেত্নী কিলবিল করবে!

নোনাপুকুরের ধারের বেলগাছটার তলায় বসে?

সেখানেও তো শোনা যায় ব্রহ্মদত্যির বাসা।

তাহলে?

তাহলে কী জঙ্গলে চলে যাবে?

'ওলাইচণ্ডীর জঙ্গলে?'

ওলাইচণ্ডীর জঙ্গলটি হচ্ছে পুরো একটি পাড়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর গজিয়ে ওঠা গাছপালা লতাপাতা! কবে কতকাল যেন আগে একবার 'মা ওলাইচণ্ডীর' কোপে পড়ে গরু, বাছুর, ছাগল, কুকুর সমেত পাড়াকে পাড়া উজাড় হয়ে গিয়েছিলো। ঘরের মড়া ঘরে পচে শুকিয়েছে। ভয়ে কেউ তার ধার দিয়ে হাঁটতো না। কালক্রমে ক্রমশ সেই সব চালাঘর ভেঙে পড়ে গিয়ে গিয়ে স্তূপ হয়েছে, এবং তারই খাঁজে খোঁদলে গাছ গজিয়ে জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছে।

সেই বেওয়ারিশ জায়গাটা দখল করে নিয়ে কেউ যে আবার ঘর বানিয়ে বসত করতে যাবে এমন চেষ্টা দেখা যায় না। তেমন অসম-সাহসিক কাজ একমাত্র সরকারই করতে পারে। তবে আপাতত সরকারের 'জঙ্গল সাফ'-এর কোনো চিন্তা-ভাবনা দেখা যায় না। গ্রামের একধারে ওই আগাছার জঙ্গল বেশ খানিকটা জমাট দৃশ্য হয়ে বসে আছে। তপস্যার পক্ষে 'বনজঙ্গলই' অবশ্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু—

কিন্তু—রাতে একা সেখানে যাওয়া?

সর্বনাশ! ভাবলেই তো গা কেঁপে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত তপস্যার যোগ্য ভূমি আবিষ্কার না হওয়ায় (মানে সর্বদিকে যোগ্য) ফ্যালা বাড়ির ছাতটাকেই নির্বাচন করে ফেলে। ফ্যালাদের পাড়ায় একমাত্র ফ্যালাদের বাড়িটাই দোতলা। কাছেপিঠে সবই একতলা। এবং তাদের অনেকগুলোই 'কোঠা' আর 'চ্যালার' মিশ্রিত রূপ। এ বাড়িটাও অনেকটা তাই। রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, সারা বছরের ফসল ছোলা-মটরের বস্তা রাখার ভাঁড়ার ঘর। সবই চালা। তবে বাকিটা পাকা দালানবাড়ি। কিন্তু তিন না চার পুরুষের আগে বানানো সে বাড়ির এখন ভগ্নদশা। সারানোর পাট নেই।

'সিঁড়ি ভালো নয়' বলে মহিলাদের বড়ি আচার আমসত্ত্বর কারবারেও ছাতে ওঠার পাট নেই। দরকারই বা কী? উঠোনটা তো নেহাত ছোটো নয়। রোদেও চড়চড় করে।

তা 'সিঁড়ি নড়বড়ে' বলে ভয় খাবার ছেলে ফ্যালা নয়! সে তো ঘুড়ি ওড়াতে ওঠেই ছাতে।

ঠাক্‌মা টের পেলে, চেঁচায় 'মরবে মরবে' এই ছেলে একদিন পড়ে হাড়গোড় ভেঙে মরবে।...তার সঙ্গে পিসঠাক্‌মা দোয়ার দেয়,.

শুধু তো নিজেই মরবে নাগো, গুষ্টিসুদ্ধকে মেরে মরবে। যা দেখছি ওই দাপাদাপিতেই কোনদিন ছাদটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। পড়লে পড়বে। ওর আর কী! দস্যি পাহাড়।

মা সাবধানে গিয়ে তুতিয়ে পাতিয়ে ছেলেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। বলে, মাঠে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াগে না বাবা। সকল ছেলেই তো তাই ওড়ায়।

তাদের ছাত নেই তাই মাঠে ওড়ায়।

তা হোক। তুই নেমে আয়।

ফ্যালা গজগজ করতে করতে নেমে আসে।

'পাঁচ পুরুষের ভিটে, পাঁচ পুরুষের ভিটে' বলে অহঙ্কার তো খুব সব। তো সাত জন্মে সারানো হয় না ক্যানো?

কথাটা খুড়োর কানে গেলে ভেঙিয়ে বলে ওঠে, হয় না তোমার পরামর্শ পাওয়া হয়নি বলে!···কেবল ছোটমুখে বড় কথা!

ফ্যালা বলে ওঠে, আমি বড় হলে দেকো এই ভিটেবাড়িটাকে কতো সুন্দর করে সারাবো! নতুন ছাত সিঁড়ি বানিয়ে দিতে বলবো মিস্তিরিদের। বলবো, "এখন তো নাকি পাঁচ পুরুষ চলছে। এরপর তো সাত আট পুরুষ হবে। শক্ত করে সারাও।"

খুড়ো ঠোঁট উল্টে বলে, "কার ছেরাদ্দ কে করে।" উনি আসবেন সাত পুরুষের ভিটে মেরামত করতে।···ভেতরে ভেতরে ঘুঘু। মদত পাচ্ছে তলে তলে। ওই ভাবেই কায়েম হবার ব্যবস্থা পাকা করার তাল। বুঝি না কিছু?

তা বলে বলুক। 'খুড়োর কতা না ব্যাঙের মাথা!' ওর কথার কোনো মানে আছে? না থাকেই কখনো? কী ভেবে যে কী বলে কে জানে। হচ্ছে বাড়ির কথা, হঠাৎ শ্রাদ্ধ'র কথা ফাঁদার মানে? ওটা তো একটা খারাপ ব্যাপার। মানুষ মরলেই তো ওসব হয়। ধুস! মাথায় ছিট আচে বোধহয় খুড়োর।

তো যে যাক। বড়লোক হয়েই প্রথম কাজই হবে ফ্যালার বাড়িটাকে সারানো। গায়ের নোনাধরা দেয়াল-টেয়াল ভেঙে নতুন দেওয়াল করে রঙ দেওয়াবে। ইস্টিশানের ধারের দোকানগুলোর মতো সুন্দর গোলাপী রং।

এগারো বছরের ফ্যালা যে মনে মনে এইসব ভাঁজে এও এক রহস্য। কোন ছেলেটা আবার এসব ভাবতে বসে? আসলে ফ্যালার সবকিছু 'সুন্দর' দেখতে ইচ্ছে করে।

বাড়িটা সুন্দর হবে। সবাই সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে থাকবে, ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর রান্নাটান্না হবে। বাড়িতে মুখুজ্যেবাবুদের বাড়ির মতন ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে, ফ্যালা দেখে সুখ পাবে।

তো ওই অসম্ভব সম্ভব করা সুখটি পাবার জন্যে 'তপস্যা' ছাড়া আর কী উপায় আছে?

রাতে পা টিপে টিপে সিঁড়ি উঠে ছাতে চলে গেলেই সেই তপস্যার পথ উন্মুক্ত। তবু একটু খোঁচ্।

এই গেঞ্জি হাফ-প্যান্ট পরে কী তপস্যা করা উচিত? একখানা কাচা ধুতি আবশ্যক। এবং সেটি ওই পিসঠাকুমাদের মতো 'শুদ্ধু কাপড়' হলেই ভালো হয়। রোজ রোজ কে কাচতে বসবে? কিন্তু সেটি জুটবে কী করে?

চাইলে দেবে ওরা একখানা?

তাহলেই হয়েছে। কিপটের রাজা।

তো ওদের অজানতে একখানা 'কেটের' ধুতি হাতিয়ে আনা হয় তো খুব শক্ত নয়। দুদিন 'কোথায় গেল, কোথায় গেল' বলে চিল্লোবে, তারপর ভেবে নেবে—বোধহয় হিসেবের ভুল। আলনায় ছিলো না। দু'জনা গিন্নীর মিলিয়ে তো অনেকগুলো থানধুতি 'কেটে মটকা' না কী সব মজুত। একখানা সরালে অসুবিধেতেও পড়বে না। টেরও পাবে না।

কিন্তু 'চুরি করা' জিনিস পরে 'তপস্যা' কী বিধিসম্মত? সেটাই এখন চিন্তার বিষয়। গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলে কী চুরির পাপ কাটবে? তো কাটতেও পারে। পরের বাড়ি থেকে চুরি করা তো আর নয়। নিজেদের বাড়িরই তো। তিনবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেবে না হয়। একবার হাতিয়ে ফেলতে পারলেই হলো।

অতএব ওই হাতানোর তালটি চলছে এখন মনে মনে। কখন কোন সময় সকলের অলক্ষ্যে করা যাবে। ওনাদের ঘরে ঢুকলে

তো 'কী করছিস' 'কীসে হাত দিচ্ছিস' ? 'কী ছুঁয়ে ফেলছিস ?' বলে হৈহৈ করে উঠবে। তক্কে তক্কে থাকতে হবে। ব্যস, একবার একখানা বাগাতে পারলেই লেগে যাওয়া যাবে কাজে।

'ফ্যালা' নামের ছেলেটা, যাকে সর্বদা 'এঁচড়ে পাকা' বিশেষণে ভূষিত করা হয়, সে অবিরত এই একটা অদ্ভুত কাঁচা স্বপ্ন দেখে চলে।

কিন্তু তার মা ?

সুষমা ঘোষাল।

সে তো বোকাও নয়, পাকাও নয়। অথবা ওই ছেলেটার মতো অবাস্তব বুদ্ধির শিকারও নয়, তবু সেও তো আজ কতোদিন থেকেই একটা অবাস্তব স্বপ্ন দেখে চলেছে! স্বপ্ন দেখে আর ক্যালেন্ডার দেখে। দেখে দেখে কীসের যেন একটা হিসেব কষে! সেইটা ঠিকমতো কষে ফেলতে পারলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অবশেষে একদিন সেই হিসেবের সাহসে পড়লো ঝাঁপিয়ে।

রাত্রে ভুবন যখন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলেছে, 'পিঠটা ঘামাচিতে ভরে গেছে। মেরে দাও তো গোটাকতক।'

তখন সুষমা একখানা বহু ব্যবহৃত সমুদ্রের ঝিনুক হাতে নিয়ে বরের সেই আরামদায়ক কার্জটি করতে করতে বলে ওঠে, ফ্যালার তো এগারো ভরে আসতে চললো। এই বেজোড় বছরটা থাকতে থাকতেই ওর গলায় সুতোটা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলো না। জোড়া বছর পড়ে গেলে তো—

'জোড়া বছর' পড়ে গেলে কী হবে, সে পর্যন্ত শোনার ধৈর্য ধরে না ভুবন ঘোষাল। আরামের আবেশ ভুলে ছিটকে উঠে বসে বলে ওঠে, কী ? ফ্যালার গলায় সুতোটা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ? তার মানে পৈতে দিতে হবে ফ্যালার ? উপনয়ন। উপবীত ধারণ ! ···তোমার যে দেখছি 'বসতে পেলে শুতে যাওয়ার অবস্থা'। ফ্যালার পৈতে। ভাবতেও বা পারলে !

সুষমা জানতো এ প্রসঙ্গ তুললে কিছু কথা কাটাকাটি হবে, কিন্তু এভাবে এক কোপে কাটা পড়তে হবে, সেটা ভাবতে পারেনি। তো সেটা পারেনি বলেই বোধহয় হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহের

তীব্র বিদ্যুৎশিখা জ্বলে ওঠে চিরভীতু মানুষটার। তাই ফস করে জ্বলে ওঠার ভঙ্গীতেই বলে ওঠে, কেন? ভাবতে না পারার কী হলো? ও এই ঘোষালবাড়ির ছেলে বলে গণ্য নয়? আমাদের ছেলে বলে পরিচিত নয়?

ভুবন গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমার' কথা বাদ দাও, তোমার কথাই বলো। তুমি অবশ্য ওকে—তাই ভাবো।

কেন? একা আমিই বা কেন? ইস্কুলের খাতায় ওর নাম-পরিচয়ে কী লেখা আছে? গার্জেনের নামে আমার নাম? আর বাপের নামের জায়গায় ঢ্যারা?

সুষমার এমন অগ্নিমূর্তি কখনো দেখেনি ভুবন। একটু থতমত খায়। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলে, তা অবস্থায় পড়ে ভর্তির ফর্মে বাপের নামের জায়গায় আমার নামটাই বসাতে হয়েছে বটে। উপায় কী? কিন্তু তার অধিক বাড়াবাড়িতে দরকার কী? পৈতে দেবার আবদার কেন?

তা বামুনবাড়ির ছেলে, তার পৈতে হলো না। এরই বা কী জবাব?

সুষমা যে এমন করে যুদ্ধে নামতে পারে, তা জানা ছিলো না ভুবনের।

এখন আপসোসের গলায় বলে, তো সেই প্রথম কালেই তো বলা হয়েছিলো, গরীব বামুনের ঘরের ছেলে। পালন-পোষণ করতে পারবে না বলে মা-বাপ 'দত্তক' নিতে দিয়েছে বলে একটা নিয়মমাফিক দত্তক নিয়ে নেওয়া হোক। তা মানলে না গোঁ ধরে বসা হলো' মিছে কথা দিয়ে জীবন শুরু করা হবে না।'...ওকে মা ষষ্ঠী নিজে হাতে করে তোমার কোলে দিয়ে গেছেন। 'ভগবানদত্ত' এই পরিচয়েই মানুষ হোক ও।

যেটা সত্যি বলে বুঝেছি, সেটাই বলেছি। মা ষষ্ঠী নিজে এসে কোলে ফেলে দিয়ে যাননি? তুমি তার সাক্ষী ছিলে না? দেখনি নিজের চক্ষে।

ভুবনও একটু জেদের গলায় বলে, সাক্ষী ছিলুম, তা মানছি। নিজের চক্ষেই দেখেছি তবে তাঁকে স্বয়ং 'মা ষষ্ঠী' বলে মনে করেছি

বলে তো মনে পড়ছে না! একজন ভালো ঘরের, বড় ঘরের বৌ বলেই ঠেকেছে। গায়ে গহনাও তো ছিলো বিস্তর। চেহারাও ওই ভালো ঘরের মতোই। কিন্তু দেবদেবী ভাবতে বসবো কেন?

দেবী না হলে অমন 'ছলনা' করেন?

ভুবন একটু ব্যঙ্গ হেসে বলে, 'ছলনা' দানবীতেও করে। সে যাক। তবে গোড়া থেকেই ভুল করেছো তুমি। 'পুষ্যি' নিলাম বলে—লোক জানাজানি করে একটা ব্যবস্থা করে নিলে, সংসারের সবাই সেটা মেনে নিতো। আইনও তোমার পক্ষে হতো। তুমি ওকে যাই ভাবো, আইন তো ওকে এ বংশের বলে গণ্য করে সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজী হবে না!

সুষমা একটু দমে যায়। তারপর আস্তে বলে, 'মায়ের দান', 'দেবতার দান' ভেবেই ওসব করতে চাইনি। ভেবেছি ওতে মায়ের কৃপা-করুণাকে অপমান করা হবে।

তোমার ভাবনা নিয়ে তুমি থেকেছো, আমার কিছু বলবার ছিলো না। আইনমাফিক পুষ্যি নিলে, আমিও একটু জোর পেতুম। বলতে পারতুম 'ওরও এ সংসারে দাবি আছে, হক আছে।' তো মূলেই ভুল।

সুষমা এখন আবার একটু জোর দিয়ে বলে, তা বেশ তো এখন নয় পৈতেটা দিয়েই, 'ঘোষালবাড়ির ছেলে' বলে পরিচয় পাকা করে নাও।

ভুবন সুষমাকে নরম হতে দেখেই আবার শক্ত হয়ে ওঠে। বলে, সে আমি পারবো না। ওর জাতজন্ম যে কী, তার ঠিক আছে কিছু? তাই ওকে পৈতের অধিকার দেবার নাটক করতে বসবো?

সুষমা শান্তভাবে বলে, এই একটু আগেই তো বললে, গোড়াতেই 'বামুনের ঘরের ছেলে' বলে চালিয়ে নিলে সুবিধে হতো। যুক্তিটা অকাট্য কিন্তু সেও তো তাহলে নাটকই হতো।

যুক্তিটা অকাট্য। কিন্তু ভুবন কী তাবলে কোণঠাসা হবে?

না, তা সে হয় না। সেও স্থির গলায় বলে সে তখন নেহাৎ কাঁচ শিশু ছিলো, 'শিশু নারায়ণ' বলে মেনে নেওয়া যেতো। মনে অপরাধবোধ আসতো না। এখন ওই একখানা দস্যিদামড়া, ঢ্যাঙা

তালগাছ ছেলে, গোঁফ গজাবার বয়েস হয়ে এলো, এখন সেভাব আসতে পারে ? 'বিবেক' বলে একটা জিনিস তো আছে।

বিবেক।

সুষমা আস্তে বলে, তোমাদের বিবেক তোমাদের মতন, আমার বিবেক আমার মতন। আমার মর্মে গাঁথা হয়ে আছে—ফ্যালা আমার 'সত্যি' ছেলে। মনে হয়, ওকে আমি পেটে ধরেছিলাম, বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলাম—

থেমে যায় বলতে বলতে। গলার স্বর বসে যায় বলেই। ভুবন সেদিকে লক্ষ্য করে না। বরং ব্যঙ্গের গলায় বলে, 'মনে হয় !' তোমার 'মনে হওয়ার' তো কোনো যুক্তি জিগ্যেসা নেই। তাই একজন মানুষের ঘরের বৌকে 'দেবী' বলে মনে হয়।···একজন মেয়েছেলে কেন একটা নেহাত দুগ্ধপোষ্য কচি শিশুকে তোমার কোলে গছিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো, সে কথা নিয়ে কিছু মনে হয় না। ভাবের ঘোরেই আছো। ভেবেছো কোনোদিন সেই মহিলাটি কেন এমনটা করলো। আর কী তার জাতগোত্তর। কী তার পরিচয়।

ওসব নীচু চিন্তা আমার আসে না কোনোদিন। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখলাম, খানিক আগে যে 'ষষ্ঠীতলায়' ঢিল বেঁধে মানত করে এলুম সেই ষষ্ঠীদেবীই পাথরের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃমূর্তি ধারণ করে শিশু কোলে করে আমার সামনে এসে বলে উঠলেন, 'ধরো তো একে—'

ভুবন আবার শুয়ে পড়ে বলে, ওই তো ! ওই মনে হওয়া নিয়েই তোমার কারবার। নাও এখন পাঁচালি থামাও, একটু ঘুমোতে দাও।

তার মানে ওর পৈতে দেওয়া হবে না ?

সুষমার মুখে আবার জেদ ফুটে ওঠে।

'হবেটা' কী করে, সেটা ভাববে তো ? ও যে কার ঘরের ছেলে তা জানো তুমি ? ভট্টাচার্যমশাই বা দিতে চাইবেন কেন ? উনি তো ওর ইতিহাস জানেন।···তোমার হাতে-পায়ে পড়ে কান্নাকাটির ফলে দিব্যি গেলে বসেছিলেন, 'কাউকে বলবেন না' বলে তাই তেমন চাউর হয়নি খবরটা। এখন ওর পৈতে দিতে বললে যদি 'না' করে.

বসেন ? 'অন্নপ্রাশনে' নান্দীমুখ করতে রাজী হয়েছিলেন কী? যো সো করে একটু নারায়ণ-পুজো করে সেরে দিয়েছিলেন। মনে আছে ? না কী নেই ?

সুষমা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সবই মনে আছে। তবে ভাবছি, অমন সোনারচাঁদ একটা ছেলে। বলতে গেলে একযুগ ধরে তোমাদের ঘরে পালিত হচ্ছে, তবু তোমরা কেউ তাকে 'আপন' করে নিতে পারলে না। এটাই আশ্চয্যি! ও তো মনেপ্রাণে জানে এটাই ওর বাড়ি

ও তাই জানবে সে আর আশ্চয্যি কী ? ও তো জ্ঞান থেকেই এই সংসারটাই দেখছে। তবে সংসারের লোক তো আর তা নয়। ওসব পৈতে-ফেতের বায়না ছাড়ো, খুঁচিয়ে ঘা করতে যেও না! যেমন চলছে চলুক।

সুষমা বোধহয় ঠিক করেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেই। তাই রুদ্ধকণ্ঠে বলে, তার মানে তুমি ওর বিয়ে-টিয়েও দেবে না কোনোদিন ?

বিয়ে। ফ্যালার! এক্ষুনি থেকে সেটাও ভাবতে বসেছো ?

ভুবন ঘোষাল ব্যঙ্গের গলায় বলে, "গাছে না উঠতেই এককাঁদি।" এই তো বললে এগারো বছর বয়েস!

তো হবে তো একদিন বিয়ের বয়েস ? তখন বলতে বসবে, "কী করে কনে খুঁজতে বসবো ? কে জানে ওর কী জাত-গোত্তর—"

ভুবন অবহেলায় বলে, তো সেটাই তো বলতে হবে। বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে, জেনেশুনে অন্য ব্রাহ্মণ সন্তানের জাত মারতে বসবো না ? পরকালে একটা জবাবদিহির দায় আছে তো ?

ওঃ। পরকাল! কতো ধর্ম অধর্ম মেনে চলছে এখনকার লোক! তো ফ্যালাকে দেখে কী তোমার মনে হয় ও হাড়ি-বাগদি মেথর-মুদ্দফরাসের ঘরের ছেলে ?

"তোমার মতো অতো মনে হওয়া-হওয়ি নেই আমার। ও কী ঘরের ছেলে, সেটা জানা নেই, এটাই হচ্ছে আসল কথা। তো আজ আর ঘুমোতে-টুমোতে দেবে না না কী ? ফ্যালার বিয়ের বয়েস

আসতে কে থাকে কে না থাকে, তার ঠিক আছে? ভদ্দরলোকের ঘরের জামাই হবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি করবে এমন আশ্বাস আছে? খামোকা ঘুমটার দফারফা হয়ে গেলো। সরো শুতে দাও।"...বলে শুয়ে পড়ে দেয়ালমুখো হয় ভুবন। মানে একদম মুড়িসেলাই।

আর কার সঙ্গে তর্কাতর্কি করবে সুষমা?

খাট থেকে নেমে পড়ে সুষমা ঘর থেকেই বেরিয়ে আসে। নাঃ, এই দম-আটকানো চাপা ঘরে টেকা যাবে না এখন আর। দালানে চলে আসে। ফ্যালার ঘরেই গিয়ে শুয়ে পড়বে আজ সুষমা। দালানের একটেরের ওই ছোট্ট ঘরটায় পুব-দক্ষিণ দু'দিকে জানালা আছে। হাওয়া খেলে।

এ যাবতকাল তো মা-বাপের ঘরেই শুয়েছে ফ্যালা। তবে কিছুদিন হলো, হঠাৎ বাব্বাঃ বাবার যা নাক ডাকে। ঘুম আসে না—বলে অন্য ঘরে অধিষ্ঠান হয়েছে ফ্যালার। ওই ছোট্ট ঘবটা 'শোবার ঘর' বলে গণ্য নয়, সংসারের আলতু-ফালতু জিনিসের গুদাম হিসেবেই পড়েছিলো জঞ্জাল-টঞ্জাল বুকে করে। ফ্যালা সেই ঘরটাকে সাফসুতরো করে নিয়ে কাজে লাগিয়েছে।

সুষমা সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখে দরজা টাইট করে বন্ধ। এমন তো করে না। ফ্যালার ঘরের দরজা-জানলা তো সব দিনই দুহাট করা থাকে।

হাওয়ায় ভেজিয়ে গিয়ে চেপে বসেছে?

ঠেলে দেখলো।

না তো। খিল-ছিটকিনির ব্যাপার।

টুকটুক করে টোকা মারলো বার কয়েক।...খুলল না।

তার মানে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।...কিন্তু এতো গরমে দরজায় খিল কেন?

ওঃ। বোঝা গেছে। বেড়ালের ভয়ে।...একদিন মাঝরাত্তিরে একটা হুলো বেড়াল ঢুকে পড়ায় কী দাপাদাপিই করেছিলো ছেলে।...থাক আর বেশী ডেকে কাজ নেই। আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে হয়তো আঁ আঁ করবে। হয়তো বাকি রাতটা আর ঘুম হবে না।

দরজার কাছ থেকে সরে এসে দেয়ালধারে শুধু মাটিতে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে পড়ে সুষমা। স্বপ্নেও ভাবতে পারবে কী ফ্যালার ঘর ভিতর থেকে খিল লাগানো নয়, বাইরে থেকে 'ছেকল' লাগানো। সেই ছেকল খুলে কপাট ঠেলে দেখলে দেখতে পেতো ঘর ফাঁকা। ঘরের মালিক হাওয়া।

কপাটের ওপর মাথার চৌকাঠের দিকে আর কে তাকাতে গেছে ?

শুয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুম কী এলো সুষমা নামের আহত অভিমানে উদ্বেলিত মেয়েটার !

ঘুমের সাধনায় মুদ্রিত দুটি চোখের সামনে যেন রুপোলি পর্দার গায়ে ছায়াছবির দৃশ্য। গুটিয়ে থাকা ফিতে খুলে খুলে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।...

প্রথম খবরটা এনে দিয়েছিলো কাদু মাসি। মাসি নয়, মাসশাশুড়ী। বলেছিলো সুষমার শাশুড়ীকেই অবশ্য।...বিমলাদি, বৌমার জন্যে অনেক কিছু তো করলে, তবু আর একবার হেস্তনেস্ত দেখ দিকি। আমার এক ভাগ্নীর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে নাকি এক জাগ্রত দেবী আছেন, সুফলদায়িনী "বনষষ্ঠী" !...সেই বনষষ্ঠীতলায় গিয়ে ষষ্ঠীপুকুরে চান করে, মায়ের বটগাছের ডালে ঢিল বেঁধে এলে অব্যর্থ ! বছর না ঘুরতেই সন্তান কোলে আসবে।

যেহেতু খবরটা বিমলাবালার নিজের মাতৃকুলের দিকের, তাই তাতে একটু বিশেষ মন দিয়েছিলো বিমলাবালা ! নচেত ইদানীং আর ওইসব মাদুলি-কবচ তাগা-তাবিজ ঢিল বাঁধা ঘোড়া মানত-টানতে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছিল না। কাদু তার মাসতুতো বোন, প্রায় সমবয়সী। কাদুর ঘরভরা নাতিনাতনী, আর বিমলার ঘর শূন্য। মেয়েদের দিকে অবশ্য আছে কতকগুলো, কিন্তু তারা তো আর বিমলার নিজস্ব জিনিস নয়। কথায় বলে, পরের ছেলে খায়, আনপানে চায়। ঘরের ছেলেটি হলেই তবে না ঘরপানে চাইবে।

বারো বারোটা বছর বিয়ে হয়েছে বড়ছেলের, তো বৌয়ের 'না

রাম, না গঙ্গা'।...ইত্যবসরে ছোটছেলেটার বিয়ে দিলো, কিনা ঘরবসতে আসবার আগেই বাপের ঘরে পুট করে মরে গেল।...আর সেই র‍্যালার মধ্যে কিনা নিজের একসঙ্গে একজোড়া মেয়ে।...সেই লজ্জার জ্বালাতেই বৌয়ের অক্ষমতায় জ্বলুনি ধরেছিলো বিমলার, এবং বৌয়ের জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি।

তো হাল ছাড়ার মুখে আবার এই নতুন সংবাদ।

বিমলা উৎসাহিত হয়। তো সে ভাগ্নীর শ্বশুরবাড়ির দেশটা কোথায় ?

তোমাদের এই বর্ধমান জেলাতেই গো! গ্রামের নাম 'হাট-চালতেপুর'। রেল ইস্টিশান আছে। ইস্টিশানে নেবে রিকশওলাদের একবার বলে দিলেই হলো 'বনষষ্ঠীতলা'য় যাবো, ঠিক পেঁাছে দেবে।

ছেলেকে ধরে পড়লো বিমলা, তুই একদিন ছুটি নিয়ে বৌমাকে নিয়ে যা।

ছেলে বিপন্ন বিব্রত, ঢের তো হলো মা, আর কতো হবে ?

কাদু বলেছে 'অব্যর্থ'।

এমন তো অনেকেই অনেক বলেছিলো মা।

তা হোক। তুই অমত করিস না! কতায় বলে—'মন্দের সাধন নয়তো শরীরপতন'! আবার—'যেখেনে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই—'

তো সেই 'ছাই উড়ানোর মনোভঙ্গীতেই' বৌকে নিয়ে ভুবনের 'হাট-চালতেপুর' যাত্রা।

যথাযথ নিয়ম পালন করা হয়েছিলো বৈকি।

ষষ্ঠীপুকুরে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ষষ্ঠীর বটগাছের ডালে ঢিল বেঁধে 'চাঁদের মতো একটি ছেলে' মানত করে, প্রসাদী ফলমূল খেয়ে ফিরে এসে, রিকশওলাটাকে বাড়তি বখশিশ দিয়ে, ছুটিয়ে এনে ট্রেনের টাইমমাফিকই এসে পেঁাছে চড়ে বসেছিল একখানা থার্ডক্লাশ কামরায়, পেরেক-ওঠা বেঞ্চিতে।

তবু সুষমার মুখ আশায়-বিশ্বাসে আনন্দে-আহ্লাদে ছলছলে।

কেন যেন মনে হচ্ছে এবার বুঝি পেয়ে যাবে সেই একান্ত প্রার্থিতকে। ওখানে সব্বাই বলছে, 'একেবারে জাগ্রত দেবী'।...'যেন নিজে হাতে ছেলে কোলে ধরে দেন.' দেখলোও কতো জন শিশু কোলে নিয়ে মানতি পুজো সারতে এসেছে। মনস্কামনার সিদ্ধিতে তাদের মুখে যেন হাজার বাতির আলো।

তবে ভুবনের মুখ বেজার বেজায়!

সারাদিনের হ্যাঙ্গামা ক্লান্তি খরচাপাতি আর উপোস, সব মিলিয়ে অবস্থাটি পুরুষমানুষের পক্ষে সুখময় নয়, অন্তত আহ্লাদে ছলছলাবার মতো নয়। তবু এরকম দায় পোহাতেই হয় তাকে মাঝে মধ্যে।

তবে মনেপ্রাণে তো জানে 'বনষষ্ঠী' 'মন্দিরষষ্ঠী' কারো কোনো কলকাঠিই কাজে লাগবে না।...একদার ইস্কুলের সহপাঠী, কলকাতায় ডাক্তার হয়ে বসা এক বন্ধু সেই কবেই সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছিলো, "কেন আর বৌটাকে মাদুলি-বাবাদুলির ভারে ভোগাচ্ছিস। আর আশার ছলনায় ভোলাচ্ছিস বাবা। বাঁজা তো তোর বৌ নয়, আসল পাপে পাপী তুই নিজেই।"

কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর অপমানজনক 'সত্যি' কথাটা কী স্বীকার করবার যোগ্য? অতএব—যা শত্রু পরে পরে।...সেই মুখফোঁড় বন্ধুটা তো আর ময়নাপুরে এসে আসল খবরটা ফাঁস করে দিয়ে যাবে না! আর করলেই কী তার এই ময়নাপুরের পড়শীজনেরা সেকথা বিশ্বাস করবে? হয়তো বলে বসবে, "এমন কথা তো সাতজন্মে শুনি নাই! মেয়েলোক ওই হয় তাই জানা।"

যাকগে—ফাঁস হবার আশঙ্কা নেই। বৌটাই আপন অক্ষমতার লজ্জায় মরমে মরে থাকুক।...কী আর করা। তবে মাঝে মধ্যেই বৌকে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হয় এমন এখান সেখান। মানে—যেখানে মা পিসি বা পাড়ার হিতৈষিণী গিন্নীদের দৌড় পেঁছয় না। না গেলে ভয়—পরে ভবিষ্যতে বৌ না বলে বসে, "তুমি তো আমার জন্যে কিছুই করনি।"

তো ট্রেনে চড়ে বসামাত্রই ট্রেনটা নড়ে উঠলো।

এখানে 'স্টপ' তো মাত্র এক মিনিটের, তবে ওই 'বনষষ্ঠীর'

দোলতে, গাড়িকে এখানে জিরেন খেতেই হয় আর একটু। দলে দলে লোক আসে।

এটাই এক রহস্য।

যে কোনো জায়গায়' অজ গ্রামের কোনো কোণে, দুর্গম পথ হলেও—একবার কোনো 'দেবদেবী-মাহাত্ম্যকথা' প্রচার হয়ে পড়লেই, কেমন করে যেন সন্ধান পেয়ে দিক-দিগন্তর থেকে ছুটে আসবে লোকে, ভিড় জমাবে, মেলা বসাবে 'তিথি' বিশেষে।

গাড়ি নড়ে উঠতেই ভুবনও রিকশওলার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চট করে চড়ে বসলো। আর ঠিক সেই 'মুহূর্তে''—হ্যাঁ, ঠিক তক্ষুণি কে জানে শুভ কী অশুভ, সেই মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটলো! হানচান করে গাড়িতে উঠে পড়েন এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী অভিজাত চেহারার মহিলা। কোলে পশমের জামা-টুপি-মোজায় আচ্ছাদিত একটি শিশু?

হাঁফাতে হাঁফাতে সুষমার কাছে এসে, একে একটু ধরুন তো ভাই। গাড়িতে উঠতে টাকার ব্যাগটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেলো—বলেই বাচ্চাটাকে সুষমার কোলে ধরিয়ে দিয়ে ফস করে গাড়ি থেকে নেমে যান।···আর পরমুহূর্তেই গাড়ি চলতে শুরু করে।

ভুবন দরজায় এসে ব্যগ্র-ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক তাকায়, কোনদিকে গেলেন মহিলা। পাত্তা নেই। গাড়ি ততক্ষণে ছুট ধরেছে।

বলতে কী গাড়ির বাকি যাত্রীরা সকলেই প্রায় খেটে-খাওয়া শ্রেণীর। চাল-চালানের কারবারিও তো বেশ কজন। তাছাড়া বাজারের ফড়ে গোছের কয়েকজন।

ব্যাপারটা কী ঘটে গেল, বুঝতেই কিছুটা সময় লাগলো তাদের. তবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ, ''কী হলো আজ্ঞে?''

সম্বোধনে 'বাবু' শব্দটি একালে লোকে একটু কমই ব্যবহার করে। তাই 'কী হলো বাবু?' না বলে 'কী হলো আজ্ঞে?'

হতচকিত সুষমা তখন এই মাঘ মাসের ঠাণ্ডাতেও ভিতরে ভিতরে কুলকুল করে ঘামছে। কিন্তু ভুবন ঘোষাল চট করে সামলে

নেয় পরিস্থিতিটা। বলে ওঠে, "আর কী হলো? টাকার ব্যাগ খুঁজতে গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো।"

ছেড়ে তো দেলো দেকলুম। তো ওই খোকাটা? ওর কী হবে?

খোকাটার আর কী হবে? মাসির কোলে চেপে নিজের বাড়ি পেঁাছে যাবে।

মাসি। আপনাদের চিনাজানা?

তাছাড়া? চেনাজানা না হলে কেউ ছেলে রাখতে দেয়? উনি এনার মাসতুতো বোন।

অ। তাই বলেন। তো ওনার সঙ্গে কোনো পুরুষ বেটাছেলে নাই?

এই আমরাই তো ছিলাম!

তো—উনি তো এখন টেরেন ফেল করলেন, কী করবেন?

কী আর করবেন? পরের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবেন।

আপনারা তালে কলকেতা থেকে আসছেন?

একই কণ্ঠ নয়, একাধিক কণ্ঠ। নিছক কৌতূহলী প্রশ্ন, না সন্দেহ-যুক্ত? কে জানে! এ যুগে কেউ আর চট করে কারুর কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সন্দেহের মন নিয়ে দেখে।

তবে ভুবন মাস্টার হঠাৎ বানচাল হতে বসা নৌকাখানার হালটা শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরে বসেছে। তাই বলে ওঠে, আসিনি কলকাতা থেকে, এসেছি অন্যখান থেকে। তো এই ছেলে পেঁাছতে বাধ্য হয়ে যেতেই হবে। এইটুকু ছেলে কে সামলাবে? কান্না জুড়লেই তো চিত্তির!

অ! তো উনি কিন্তু বেপদে পড়বে! এর পর আর ট্রেন নাই। সেই একেবারে রাত্তির আটটা চল্লিশে লাস্ট ট্রেন। এখেনে কোতাও কোনো থাকার জায়গা না থাকলে তাহলে ভুগবেন। তবে বাসে-টাসে কোনোভাবে বড় ইস্টিশানে পেঁাছে গেলে একটা কিছু বিহিত হতে পারে।

যেন ওই অবিমৃষ্যকারী মহিলাটির বিহিতের ভাবনায় এদের চিন্তার শেষ নেই।

ভুবন বেশ গলা তুলে সুষমাকে উদ্দেশ্য করে ডেকেহেঁকে বলে, তবে তোমার ওই মাসতুতো বোনটিকেও বলিহারি যাই। ছেলেটাকে ফেলে রেখে খুঁজতে গেলেন টাকার ব্যাগ! কোনটা দামী বাবা। সেই যে কী বলে 'সোনা ফেলে আঁচলে গেরো' না কী! এ দেখছি তাই।

পবন ঘোষাল তার দাদা সম্পর্কে যে ভাবই পোষণ করুক, ভুবন মাস্টার তা বলে ভ্যাবলা নয়। পরিস্থিতিটিকে কী ভাবে চট করে ম্যানেজ করে ফেললো।...গাড়ি ছেড়ে দেওয়ায় 'হাঁ হাঁ' করে উঠে ঘটনাটির স্বরূপ প্রকাশ করে বসলে—থানা-পুলিশ, পুলিশি জেরা ইত্যাদির মুখে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হতো না?

সকলেই পরামর্শ দিতো রেল পুলিশের কাছে বাচ্চাটাকে জমা দিয়ে একটা ডায়েরি করে দিয়ে যেতে। তার মানেই বাড়ি ফেরা আজকের মতো খতম! আর কে না জানে, বাঘে ছুঁলে যদি আঠারো ঘা, তো পুলিশে ছুঁলে আঠাশ ঘা।

কাজেই হারিয়ে যাওয়া মহিলাটিকে 'মাসতুতো শালী' বানিয়ে ফেলতে বিশ্বাসযোগ্য আরো কিছু কথা যোগ করে।

কিন্তু সুষমা?

সে কী তার স্বামীর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহরে মোহিত হয়? কোথায়? সে তো ওসব কিছু শুনছেও না, দেখছেও না। সে কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোলের মধ্যে পড়ে থাকা ওই অলৌকিক সম্পদটির দিকে। একটা ঘুমন্ত শিশুর মুখ এমন অলৌকিক মহিমান্বিত হয়?

এই কিছু আগে না দেবীর কাছে—প্রার্থনা জানিয়ে এসেছিলো একটি 'চাঁদের মতো' ছেলের জন্যে?

'চাঁদের মতো'-র অর্থ এর থেকে আর বেশী কী হবে?

গাড়ি চলছে, এতো রকম কথা হচ্ছে, সুষমা সেই ঘুমন্ত মুখটার দিকে তাকিয়েই আছে আচ্ছন্নের মতো!...চোখটা একটু কোঁচকাচ্ছে না? ঠোঁটটা একটু ফুলে উঠছে!

বরের কথায় একটু চকিত হয়ে তাকায়।

ভাবটা যেন কী বললে?

ভুবন আবার বলে, বলছি তোমার বোনের আক্কেলের কথা ! দেখছেন ট্রেন ছাড়ছে, ছেলে ফেলে টাকার ব্যাগ খুঁজতে নেমে পড়লেন।

সুষমা তেমনি আচ্ছন্নমতো ভাবেই বলে, "আমার কোলে দিয়ে গেলেন তো—"

কাদু বলেছিলো 'অব্যর্থ' !

কিন্তু এমন 'অব্যর্থ', যে ষষ্ঠীর বটে ঢিল বাঁধতে গিয়ে বৌ একখানা জামা-জুতো, টুপি-মোজা পরা আস্ত ছেলে বুকে চেপে নিয়ে বাড়ি ফিরবে ? এমন আশা অবশ্য ছিলো না বিমলাবালার। তাই তার চোখ কপালে ওঠে ! ফিরতে রাত হয়ে গেছে যথেষ্ট। ঘরবার করছিলো বিমলা আর তরঙ্গিণী। কাণ্ড দেখে মুখে কথা সরে না।

একী কাণ্ড ! একী সর্বনাশ ! এই সাংঘাতিক জিনিসটা নিয়ে এখন কী হবে ? কী করা হবে ?

সেই এগারো বছর আগে ঘটে যাওয়া দৃশ্যটা যেন সদ্য দৃশ্যের মতো ঘটতে থাকে সুষমার মুদিত চোখের সামনে।

ওরা বলছে, এখন এ ছেলেকে নিয়ে কী করা হবে ?

সুষমা স্বভাবগত ভীরুতা ভুলে দৃঢ়ভাবে বলে, কী আবার করা হবে ? থাকবে। আমার কাছে, সবাইয়ের কাছে, বাড়িতে।

বিমলার আর্ত উক্তি, "কাদের ছেলে কী বিত্তান্ত, কী ভেবে অমন করে গছিয়ে দিয়ে গেলো কিছুইতো বুঝতে পেরেছি না বৌমা। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে।"

তরঙ্গিণীও বলে, "বাবা, দেখছি, আর বুক কাঁপছে। যদি কোনো বদ মতলব না থেকে থাকে সেই মেয়েমানুষটার, যদি সত্যিই ব্যাগ কুড়োতে নেমে পড়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়ে বসে থাকে, তবে সে মানুষ তো এখন বুক চাপড়াচ্ছে, মাথা খুঁড়ছে, ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে !"

কিন্তু সুষমার চিন্তাভাবনার মধ্যে অমন দৃশ্য আসে না। সুষমা তো জানে, তিনি 'মানবী' নন, 'দেবী' ! সুষমাকে ছলনা করে এই

দান করে গেছেন।

তা প্রায় হিস্টিরিয়ায় আচ্ছন্ন রোগীর মতো সুষমা যাই ভাবুক,- বাস্তববাদীরা তো বাস্তব বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেবে।

পবন হ্যানস্থার গলায় বলে, লোকে বলে—"বারো বছর ইস্কুল-মাস্টারি করলে না কী লোকে গাড্ডু বনে যায়।" তো দাদার তো দেখছি বারো বছর না হতেই সে ফল ফলেছে।...দেখো না—এই দুদিন বাদেই 'ছেলে চুরির' অপরাধে পুলিশ এসে মাস্টার আর মাস্টার-গিন্নীকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে দেয় কিনা।

ছোটভাইয়ের সামনে গুটিয়ে-আসা ভুবন ঘোষাল বলে, 'চুরি'টা আবার কখন হলো? তিনিই তো ওই কর্মটি করে বসলেন। একগাড়ি লোক সাক্ষী আছে।

ওঃ। তারা তোমার হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে? হ্যা হ্যা হ্যা, পুলিশ যদি না আসে তো কী বলেছি! ওই ছেলেকে এক্ষুনি মানে মানে পুরো হিস্ট্রিটি জানিয়ে থানায় জমা দিয়ে না এলে কপালে অশেষ দুঃখু আছে তোমাদের, তা স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিচ্ছি!

'থানায় জমা দিয়ে আসার' কথা শুনেই সুষমা, লাজলজ্জা ত্যাগ করে ডুকরে ওঠে, "ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি গো। অমন কথা মুখে এনো না। ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে আমি নোনাপুকুরে গিয়ে ডুবে মরবো।"

সকলকেই একটু শঙ্কিত হতে হয়।

যা পাগলামি ভাব মাথায় ঢুকেছে, বিশ্বাস নেই। এখন একটু থামা দাও সবাই। একটু থিতোলে দেখা যাবে।

এদিকে রাতারাতি সারা ময়নাপুকুর গ্রামে চাউর, ঘোষালদের বাঁজা বড়বৌ কোন ষষ্ঠীতলায় 'পুত্র মানত' করতে গিয়ে একখানা চাঁদের টুকরোর মতো বেওয়ারিশ ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছে।

ভোর থেকে কৌতূহলী জনের ভিড়।

"কী আশ্চায্যি! কী ভাবে পেলে? কোথায় ছিলো? রেল-গাড়িতে? একা শোওয়ানো ছিলো?...তা থানায় জমা না দিয়ে ঘরে নিয়ে আসার বুদ্ধি মাথায় চাপলো কেন? কতো রকম বিপদ

আসতে পারে ওই থেকে।"…

সবাই কেবল 'বিপদের' কথাই বলে।

এটা যে কতোখানি সম্পদের ঘটনা, তা কেউ বলে না।

অনেকেই আবার সন্দেহের চোখে তাকায়। ভাবে বানানো গল্প। একটা বাচ্চাকে হঠাৎ আচমকা একটু একা দেখে টুপ করে তুলে নিয়ে সটকে এসেছে। বাঁজা মেয়েমানুষের দুরন্ত স্নেহক্ষুধা। হিতাহিত জ্ঞান মানেনি।

শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ এ কথাও বলেছে ঘোষণা করে, "ছেলের নিশ্চয় জন্মের কোনো গোলমাল আছে। 'বৈধ' একখানা ছেলেকে কেউ রেলগাড়ির কামরায় শুইয়ে রেখে এক মিনিটও নড়ে?…তাও এইরকম চাঁদহেন ছেলে। কতোটুকুই বা বয়েস হবে? বড়জোর মাস দুই-তিন।"

তা হলে?

একটা অশুচি বস্তুই ঘরে নিয়ে এসেছে বড়বৌ?

মা বললো, তোকেও বলি ভুবনো, পরিবার বললো বলেই কার না কার জিনিস তুলে নিয়ে চলে এলি? পরিণামচিন্তা হলো না?

ছোটভাই বললো, সে চিন্তার বুদ্ধি থাকলে তো! পরিবারের বশ পুরুষের ওই দশাই হয়। এ পবন ঘোষাল নয় যে, দোজ-পক্ষের পরিবারকেও চোখরাঙানির নীচে রাখবে, ট্যাঁ-ফোঁটি করতে দেবে না!

হ্যাঁ, কথা হয়েছিল বিস্তর। হাজারো রকম কথা!

এমন কী পাড়ার কিছু 'হিতৈষী'জন নিজেরা উদ্যোগী হয়ে থানায় গিয়ে খবরটা জানিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পুলিশ 'এনকোয়ারিতে' আসেনি।

অথচ কী দুঃসহ আতঙ্কে কেটেছে সেই দিনগুলি সুষমার। 'ওই বুঝি পুলিশ এলো—' এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকে ছেলেটাকে কোনোদিন নীচের তলায় নামাতো না। বাইরে অন্য কারো গলা পেলেই, তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় খিল দিয়ে ছেলেটাকে কোলে চেপে বসে থাকতো।

আর সেই যে পশমের জামা-জুতো টুপি-মোজা, সেগুলোকে একেবারে চুপিচুপি লেপের চালির মধ্যের খাঁজে গুঁজে রেখেছে কাগজে মুড়ে। পাছে সেইগুলো সনাক্ত করে ফেলে।···বাচ্চার অকল্যাণের ভয়ে যা-তা করে নষ্ট করতেও পারেনি। জলে ফেলে দিলে ভেসে উঠতে পারে, আগুনে ফেলে দিলে অকল্যাণ!

সেই ভয়ংকর দিনগুলো মনে করে এখনো বুক কেঁপে ওঠে সুষমার, গাঁয়ে কাঁটা দেয়।···ধীরে ধীরে সে আতঙ্ক বিলীন হয়ে গেছে। আসেনি পুলিশ, আসেনি কোনো দাবিদার। সুষমার দাবিটাই দানা বেঁধেছে ক্রমশ। মা 'বনষষ্ঠীর' দান!

ইত্যবসরে সেই ছেলে কখন হামা টানতে শিখে রাজ্যজয় করতে শুরু করেছে, তারপর টলে টলে এবং অতঃপর না টলে হেঁটে বাড়ি মাত করেছে। এবং সংসারের মানুষদের দলে ভিড়ে গেছে। ততোদিনে পিসি দুটো ওকে নিয়ে বিভোর হতে শিখেছে! এও তার একটা প্রাপ্তি।

'বড়বৌমার ছেলে' এই নামটি খসে পড়ে অতঃপর 'ফ্যালা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সে সবই ফ্যালার জ্ঞানের অগোচরে।···এই সময় একবার দত্তক নেওয়ার কথা হয়েছিলো, প্রস্তাব টেকেনি। সুষমা সকলের মাথার মধ্যে গেঁথে দিতে প্রায় সমর্থ হয়েছে, ছেলেটা হয়তো বা অলৌকিক কোনো মাহাত্ম্যেরই ফল।

তবে সে সময়টা সুষমা প্রায় পাগল পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

ওই যে আতঙ্ক 'ওই বুঝি কে কেড়ে নিতে আসছে,' সর্বদা সেই ছাপ থেকেছে মুখে-চোখে। আর সেই সময়ই একদিন সে বাড়ির সকলকে দিব্যি দিয়ে বসেছে, "ফ্যালার জ্ঞান জন্মালে, কেউ যদি ওকে বলে দাও ও কুড়নো ছেলে, তাহলে তক্ষুণি আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবো, নয় পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দেবো।"

ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিব্যি গালানো।

পবনকে অবশ্য তেমনভাবে পেরে ওঠেনি। পবন বলেছিলো, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে 'সত্য' একদিন প্রকাশ পেয়ে যায়ই।"

পবনের বৌ ভয়ে ভয়ে বলেছে, বলে ফেললেই তো পারতে গো!

দিদির কথাই সত্যি বলে মনে হয়।

হ্যাঁ! ভগবতী এসে ছেলেটাকে জুতো-জামা টুপি-মোজা পরিয়ে তোমার দিদির কোলে বসিয়ে দিয়ে গেছেন!···

কিন্তু ফ্যালা বড় হয়ে উঠে বীরবিক্রমেই আপন আসন কায়েম করে নিয়েছে। ফ্যালাকে ফেলে দেবার প্রশ্ন আর ওঠেনি। কারণ তখন তো বাড়িতে পবনের ঘণ্টু-পেণ্টুর আবির্ভাব ঘটেনি। একটা সুন্দর দেখতে ঘটের মতো ছেলে ঘটঘটিয়ে বেড়াচ্ছে।

তবে পাড়ার লোকেরা বলেই অনেক সময়, ফ্যালা সে কথা 'ঠাট্টা' বলে উড়িয়ে দেয়।

সুষমাও যখন দেখেছে পাড়ার লোকেরা অবোধ শিশুটাকে না বলে ছাড়ছে না তখন মরিয়া হয়ে বলেছে, "তা সত্যিই তো। ওরা ঠিকই বলে। তোকে তো ষষ্ঠীতলা থেকে কুড়িয়েই পেয়েছিলাম। মা ষষ্ঠী ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাই নাম ফ্যালা।

ফ্যালা সেকথা নস্যাৎ করে দেয়।

ফ্যালা তো পাগল নয় যে লোকে ক্ষ্যাপালেই ক্ষেপবে!

খুড়ো তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তা বোঝে ফ্যালা। মেনে নেয় ওটাই খুড়োর স্বভাব। তবু ঠাক্‌মা পিসঠাক্‌মার ব্যবহার-গুলোও তো ভালো ঠেকে না।

শেষমেষ যে সিদ্ধান্তে এসে পেঁৗছেছে ফ্যালা তার প্রতিক্রিয়াতেই না ফ্যালার মা ছেলের ঘরে এসে শুয়ে পড়বার বাসনায় ঘর বন্ধ দেখে হতাশ হয়ে দালানে শুধু মেঝেয় শুয়ে, চোখের জলে মাটি ভিজোচ্ছে।

চোখের জল কতোবার উথলে গাল ভাসালো, কতোবার যে গালে একটা শুকনো রেখা টেনে সেই জল শুকলো, আবার কোনো এক ক্ষণে আবার ভাসালো, তার গোনাগুনতি নেই। শেষ রাত্তিরে ঘুম এসে সর্বসন্তাপ নিবারণ করলো।

আজও আবার নিমের দাঁতন পর্বে খুড়ো-ভাইপোয় মোলাকাত। ভাইপো নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। তবে চোখ কচলাতে কচলাতে নয়, গা ঘষতে ঘষতে।

আশ্চর্য এই, যে প্রাণীটা পবন ঘোষালের দু'চক্ষের বিষ, সেই প্রাণীটার দিকেই যেন তার সবসময় চোখ! ফ্যালার গতিবিধি নড়নচড়ন সব দেখা চাই তার।

নিমকাঠিটা দাঁতে চেপেই বলে ওঠে পবন, এই ফ্যালা, এদিকে সরে আয় তো দেখি, মুখময় কী বেরিয়েছে! লাল লাল দানা দানা।

ফ্যালা সরে আসার গরজ করে না, অগ্রাহ্যভরে বলে, "বেরোবে আবার কী? মশায় খেয়েচে।"

মশায় খেয়েচে? ওইভাবে সারামুখে মুসুর ডাল বিছিয়ে? দাঁড়া ইদিকে। আলোমুখো হয়ে।...মা! একবার এসো তো ইদিকে।

পবনের ডাক। মা ত্রস্তে-ব্যস্তে ছুটে আসে।

কী হলো?

হলো বোধহয় ভালোই কিছু। দেখো তো ফ্যালার মুখটা। ভালো করে নজর করে। কিছু বেরিয়েছে কিনা।

ঠাকুমা দেখেই শিউরে ওঠে, ওমা! কী সর্বোনাশা এ যে সারামুখ ভরে গেছে। কই গা দেখি। ও মা গায়েও তো ছিটিয়েচে। জ্বর হয় নাই তো?

ফ্যালা বীরবিক্রমে বলে, আঃ! বলচি কিছু হয় নাই। মশায় খেয়েচে। বড় বড় ডাঁশ-মশা তাদের কীর্তি। রাতভোর খেয়েচে তো।

এতো বড় বড় ডাঁশ-মশা। রাতভোর খেয়েচে? ক্যানো মশারি টাঙাস নাই?

এই আবার এক ফ্যাসাদ। 'রাতভোর' কথাটা বলা উচিত হয়নি। সব্বাই যে এক-একখানি পুলিশ সাহেব। কী জেরা!

তবে সহজে তো বেকায়দা হবে না ফ্যালা, তাই আরো অবজ্ঞা-ভরে বলে, টাঙাব না ক্যানো? না টাঙালে মা ছাড়বে? নিজেই টাঙিয়ে দিয়ে রাখে। তো মশারির গায়ে যে ইয়া ফুটো! তার মদ্যে দিয়েই গলেচে।

ফ্যালা নিশ্চিত জানে ঠাকুমা পিসঠাকুমা কেউই এক্ষুণি বাসি বিছানা উটকে, মশারির ফুটোর মাপ দেখতে যাবে না। ওদের সে অবস্থা আসবার আগেই 'ইয়া' দু'একখানা ফুটো ম্যানেজ করা অসম্ভব হবে না!

বিমলাবালা হাঁক পাড়ে, বৌমা! অ বড়বৌমা। এসে দেখে যাওতো—

বৌমা দেখে হাঁ হয়ে বলে, এতো মশা কী করে খেলো? মশারিতে আবার ফুটো কিসের? নতুন মশারি।...

তা হলে— শেতলাবাড়িতে একবার দেখিয়ে আসা হোক। রাতারাতি তাঁর দয়া বর্ষিত হয়ে বসে আছে কিনা।...

ছোটবৌমা, তোমার ছেলেমেয়েকে ওর দিকে বেশি ঘেঁষতে মানা করো।

এই নানান ফ্যাচাং আর জেরার দাপটে ফ্যালার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং ফ্যালার 'তপস্যা'র বারোটা বাজিয়ে দেবার কুটিল উদ্দেশ্যেই যে এই ময়নাপুরের সমগ্র মশা একজোট হয়ে ঘোষালবাড়ির ছাতে উঠে এসেছিল কাল রাত্তিরে এই ঘোষণাতেই ফ্যালার গভীর গোপন বাসনাটি ফাঁস হয়ে যায়।

তারপর?

তারপর যা হবার তাই হয়।

হাসি-টিটকিরি, ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় বইতে থাকে। এবং পবন ঘোষালের নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়, ফ্যালা যেন আজ ইস্কুলে না যায় এবং পথেও না বেরোয়। দেখলেই সবাই 'হাম বেরিয়েছে' বলে আঁতকে উঠবে!

তো এ নিষেধটা অবশ্য খুব অপ্রীতিকর মনে হয় না ফ্যালার। এখন ইস্কুলে যাওয়ার বদলে বালিশ-বিছানার আশ্রয়ে গিয়ে পড়ে গতরাতের ঠেলে-রাখা ঘুমটাকে ফিরিয়ে এনে কষে একপালা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়!

কিন্তু ঠেলে রাখতেই কী হয়েছিলো?

ওই মশককুলই ফ্যালাকে জাগরিত রেখেছিলো।

নাঃ। তপস্যা করতে বসে টের পেয়ে গেছে ফ্যালা, ওপথে বড়লোক হতে যাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র! মশারা না এলে ঘুমটা আসতো! তাহলে ফ্যালার উপায়?

ঘুমের মধ্যে তলিয়ে থেকেও ফ্যালা গায়ে একটি ভারী ঠাণ্ডা

নরম হাতের স্পর্শ পায়। ঘুমের মধ্যে তলিয়েও অনুভব করে মা! মা ফ্যালার মশার কামড়ে দাগড়া গা-টার ওপর আস্তে হাত বুলোচ্ছে!

হাত বুলোচ্ছে, না একটা ফুল বুলোচ্ছে।

কী আরাম! যেন স্বর্গের কোনো জিনিস।

ফ্যালা নড়ে না। কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। জানে একটু নড়ে উঠলেই ভেঙে যাবে এই আরামের আবেশ। মা কথা কয়ে উঠবে।

কিন্তু সেই 'নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু, অবস্থাটিতে থাকা ফ্যালার পক্ষে কতোক্ষণ সম্ভব?

ফ্যালা নড়ে ফেলে। চোখ খুলে ফেলে।

দেখে মা নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মা!

বলে ফ্যালা মার হাতটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সুষমা তেমনি তাকিয়ে থেকে বলে, আচ্ছা ফ্যালা, তোর তপস্যা করার সাধ কেন?

ফ্যালা আত্মরক্ষার্থে বলে, বাঃ। তপস্যা করা বুঝি খারাপ? সেকালে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করে ভগবানকে দেখতে পেত না?

সুষমা ভেবে পায় না হঠাৎ কে তার ফ্যালার রমাথায় এমন 'চৈতন্যের' মশাল ঢুকিয়ে দিয়ে বসেছে। তাই আরো আস্তে, ঈষৎ করুণ গলায় বলে, যারা ভগবানকে দেখতে পায়, তারা তো আর ঘরসংসারে থাকে না ফ্যালা। সংসার ছেড়ে চলে যায়। আমায় ছেড়ে চলে যেতে তোর ইচ্ছে হয়?

ফ্যালা মায়ের আশঙ্কার মূল নির্মূল করে দিয়ে সতেজে বলে, ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে আমার দায় পড়েছে। আমি তো শুধু 'বর' চাইবার জন্যে—তো পাজী মশাগুলো—

মা হেসে ফেলতে গিয়েও অবাক হয়ে বলে, 'বর' চাইবার জন্যে? কী বর চাইবি?

কী আবার, অনেক অনেক টাকা!

ভগবানের কাছে বর চাইবি অনেক অনেক টাকা।

তা তাতে এতো আকাশ থেকে পড়ছো ক্যানো শুনি? টাকাই তো আসল দরকারি জিনিস।...যতো ইচ্ছে টাকা পেলে কী করবো, তা দেখে নিও। বাড়িটা সুন্দর করে ফেলবো। সব্বাইকে অনেক করে টাকা দেবো। অনেক লোক থাকবে কাজ করবার জন্যে। আর তুমি মহারানীর মতন সেজেগুজে আরাম করে বসে থাকবে।

আমি মহারানীর মতন সেজেগুজে বসে থাকবো?

মা হতবুদ্ধির মতো তাকায়, পাগল-টাগল হয়ে গেলি না কী?

কিন্তু ছেলের তখন আবেগ এসে গেছে। তাই জোর গলায় বলে ওঠে, "পাগল আবার কী? থাকবেই তো! ভালো সুন্দর শাড়ি পরে, ঝকমকে ঝকমকে অ্যাতো গয়না পরে, কপালে লাল টুক-টুকে ইয়াবড়ো টিপ পরে—"

সুষমার হঠাৎ বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। গায়ে কাঁটা দেয়। সুষমা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, কেন? ওরকম থাকতে যাবো কেন?

কেন আবার? ওইরকম রানীর মতো মা-ই তো আমার পছন্দ।

সুষমার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলে ওঠে। সুষমার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে যায়।

এ কী কোনো অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা? যে খেলা সুষমাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে সুষমার জীবনের আলোটুকু ছিনিয়ে নিতে? ফ্যালা কেন ওরকম মা চায়?

সুষমা চেঁচিয়ে ওঠে, ওইরকম রানীর মতন মা তোর পছন্দ? কেন? এই ময়লা শাড়ি-পরা, গয়না না-থাকা মাকে তোর আর ভালো লাগছে না?

সুষমার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। গলা ভেঙে যায়, কোথায় দেখেছিস তুই তেমন মা? অ্যাঁ! বল। বল কোথায় দেখেছিস?

উন্মত্ত উত্তেজনায় ছেলেকে দু'হাতে ধরে নাড়া দেয়, বল কবে দেখেছিস?...সুষমার যেন মনে হয়, তার তাসের প্রাসাদখানা হুড়-মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে।...এ যেন সেই প্রথম কালের মতো অবস্থা।

যখন ভুবন ঘোষালকে দু'হাতে চেপে ধরে বলেছে, "বলো, বলো, তুমি ওকে কোথাও নিয়ে যাবে না! থানায় নয়, পুলিশে নয়। খবরের কাগজে ছবি দিয়ে খবর ছাপাবে না!"

হ্যাঁ, এ পরামর্শও দিয়েছিলো তখন কিছু সুধীজন।

ফ্যালা ভয় খেয়ে যায়।

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ওমা! অমন করছো কেন? ঠিক আছে, আমি ওরকম মা চাই না। এই ময়লা কাপড়-পরা মাকেই চাই। আর কক্ষণো বলবো না ওকথা—

সুষমা থেমে যায়।

সুষমা অকূলে ভেসে যেতে চাওয়া চৈতন্যটিকে ফিরিয়ে এনে কূলে ভেড়ায়। আর তারপরই এক অদ্ভুত কাজ করে বসে। হঠাৎ —খুব হি হি করে হেসে উঠে বলে, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি তো? কেমন মজাটি করলুম? ওরে আমিও তো তোরই মতো চাইরে। তুই অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবি। অনেক বড়লোকও হবি। তখন আর কেউ তোকে 'ফ্যালা'ও বলবে না, 'ষষ্ঠিচরণ'ও বলবে না। বলবে 'ঘোষাল সাহেব'। বড় বড় অফিসারদের তো ওইরকমই বলে। ঘোষ সাহেব, মুখার্জি সাহেব—তো তখন ফ্যালার মার রাজার মায়ের মান্যি, রাতদিন তো এই চিন্তা আমার। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা!···তো পড়ালেখাই তো তপস্যা বাবা! শাস্ত্রে লেখা আছে সেকথা!

ফ্যালা চোখ বড় বড় করে বলে, ঠাট্টা? বাবাঃ। যা ভয় খাইয়ে দিয়েছিলে। তোমার ঠাট্টাটা বড় বিচ্ছিরি বাবা! ঠাট্টা করে বলতে ইচ্ছে হয় 'ফ্যালা' তুই আমার 'কুড়নো ছেলে'! ···'ফ্যালা··· ময়লা শাড়ি-পরা মা তাহলে আর ভালো লাগে না তো?' এ আবার কী ঠাট্টা? ভয় লাগে না বুঝি? ···তো আমি তোমায় খুব ভালো সুন্দর দেখতে চাই। ময়লা ময়লা কাপড় পরে থাকলে লোকে হ্যানস্থা ভাব দেখায়—পুজ্যি দেয় না।

সুষমা আবার চমকায়। ফ্যালারও তাহলে চোখে পড়েছে, সবাই সুষমাকে তেমন পুজ্যি করে না, হ্যানস্থা ভাব দেখায়।

দেখায় বৈকি। তাই দেখায়। কিন্তু সে কী আর সুষমা ভালো শাড়ি-গহনা পরে না বলে?

সুষমা যে নারীজগতে অপাংক্তেয়! একটা কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে নিয়ে 'ছেলে ছেলে' করে আদিখ্যেতা করে মানুষ করছে বলে কী

আর মহিলাসমাজের পাঁচজন সুষমাকে 'পুত্রবতী'র সম্মান দিতে আসবে? বিয়ে থাওয়ায়, অন্য যে কোনো শুভকর্মের কাজকর্মে, ব্রত উদ্‌যাপন-টাপনে কেউ তাকে 'সধবা ব্রাহ্মণকন্যার' সুউচ্চ পদটি দেয়? কেউ তাকে কোনো মেয়ের গায়ে হলুদ দিতে ডাকে? বিয়ের পিঁড়ি আলপনা দিতে? শ্রী গড়তে? 'বামুনের মেয়ে' নামক দুর্লভ মর্যাদাটি জোটে তার? সে যেন একটা 'অছুৎকন্যে'। তার ওপর আবার চাঁদের ওপর চূড়ো, সে একটা, কে জানে কী জাত-গোত্তর অবৈধ অশুচি কিনা তাই বা কে জানে, কুড়নো ছেলেকে মাথার মণি করে মানুষ করছে।

সুষমা প্রথম প্রথম বলেছে, "ওই চাঁদের মতো ছেলেটাকে দেখে কী তোমাদের হাড়ি-বাগদির ঘরের বলে মনে হয়?" কিন্তু যবে থেকে ওই দ্বিতীয় 'সন্দেহজনক' কথাটি কেউ কেউ মুখ ফুটে বলে বসেছে, তবে থেকে সুষমার মুখ চুপ। অশুচি অবৈধ হলেও 'চাঁদের টুকরো' হতে বাধা কোথায়?

কিন্তু সেই রূপটি কী আর এখন আছে ফ্যালার? না সেটি রেখেছে ফ্যালা? রোদে টো-টো, পুকুরে ঝাঁপাইঝোড়া, নাওয়া-খাওয়ার বেঠিক সময় সেই শৈশব-লাবণ্যটি কবেই মুছে দিয়েছে। এখন একটা তামাটে রং তামাটে চুল ধাংড়া মাপের ছেলে। ছেলে-বেলায় 'চাঁদের টুকরোর মতো দেখতে ছিলো' বলতে গেলে এখন লোকে হাসবে।

সে যাক, গ্রামে ঘরে চাষীবাসীর ছেলেদের ধারাই এই। শৈশবের রূপটি থাকে না। ফ্যালা—বামুনের ঘরের হলেও তার ধারাটা যে ওই বন্ধুদের মতো, তো রূপ থাক না থাক। বয়েই গেলো। তপস্যায় সিদ্ধাই ঘটলে লোকে এই ফ্যালার অঙ্গেই 'দিব্যজ্যোতি' দেখতে পাবে।

ঘুরেফিরে সেই একই কথা।

টাকা হলেই তার অনেক মান্য!

মা বলেছে, ফ্যালার বুদ্ধিমতো 'তপস্যা' বাস্তব ব্যাপার নয়। তাকে বাস্তব তপস্যা করে চলতে হবে। যার নাম 'অধ্যয়ন তপ'।

কিন্তু সে যে বড় বেশী সময়সাপেক্ষ ব্যাপার! ধৈর্য আসে না।

তবু ফ্যালা ধৈর্য ধরে মাতৃনির্দেশই পালন করে।

ফ্যালা উদয়াস্ত পড়ে।

ফ্যালার পিসিজোড়া বলে, "বাবাঃ। ফ্যালা, তুই কী এবারে কেলাসে ফার্স্ট না হয়ে ছাড়বি না? পুজোর ছুটি পড়ে গেলো তাও রাতদিন ঘরে বসে পড়ছিস? এদিকে—মুখুজ্যেবাড়ির ঠাকুরের কাঠামোয় একমেটে সারা! দেখতেও যাচ্ছিস না!"

তোরা দেখগে যা! 'ফি' বছরই তো দেখি! নতুন আর কী হবে?

তার মানে ফ্যালা সত্যই তপস্বীর নির্লিপ্ততা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে।

তা চলেছেই সত্যি।

এখন খুড়ো যখন বাড়ি ফিরেই হাঁক পাড়ে, "কোথা? কোথায় সেই হারামজাদা নচ্ছারটা? দেখি তাকে একবার—"

তখন ফ্যালা তেড়ে গিয়ে তেরিয়া হয়ে বলে ওঠে না, "খামোকা গাল পাড়ছো যে? মাতার মধ্যে পোকা কিলবিলোয় বুঝি?"

অথবা ফ্যালার ঠাকুমা যদি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করে, "ওই এক দজ্জাল দস্যির পাল্লায় পড়ে ছোটবৌমার ছেলেদুটোও ক্রেমশ দস্যি হয়ে উঠল গো। সকাল থেকে প্যায়রা গাছে চড়ে বসে আচে, ডেকে নামানো যাচ্চে না।"

তখনও ফ্যালা চেঁচিয়ে বলে ওঠে না, "তো বয়েস হলেই দস্যি হয়ে উঠবে। চিরকাল 'নস্যি' থেকে যাবে না কী?"

ফ্যালা তখনো অঙ্কয় মন বসিয়ে রাখে।

কিন্তু আজ?

আজ ফ্যালার স্থিরতার ওপর একখানা পাথরের চাঁই এসে পড়ে, ফ্যালাকে ছিটকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললো।

চকচকে মাজা পেতলের ঘড়াটাকে ঘাট থেকে ভরে নিয়ে এসে দাওয়ার ওপর বসিয়ে রেখে নিজেও হালসে দাওয়ার ধারে বসে পড়ে। তরঙ্গিণী বলে ওঠে, "এ সংসারের অবস্থা এখন হয়েচে ভালো। বুড়িদের আবার নতুন করে কেঁচে গণ্ডূষ! এক বুড়িকে নতুন করে

হাঁড়ি ঠেলতে হচ্চে, আর একটা বুড়ি, জল বয়ে মরচে !···গরীবের ঘরে বড়মানুষের রোগ। চিরকালই জেনে এসেছি—'হাটের' অসুক বড়মানুষদের ব্যাধি। নড়তে-চড়তে হাটফেল হবার ভয়। তো সেই রোগটি এসে ঢুকলো এই গেরস্থর সংসারে !···আরামের ব্যাধি। জ্বরজ্বালা নয়, অম্বল চোঁয়াঢেকুর নয়। বাতের যন্ত্রণা নয় অদিশ্য অসুক। নাওয়া-খাওয়ায় বারণ নাই। কিছুরই কড়া-কাড় নেই, শুদু—"

আর সহ্য করা সম্ভব হয় না। এই একটানা মেল ট্রেন চলার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ফ্যালা। বইপত্তর রেখে। কড়া গলায় বলে ওঠে, "আজকাল কী পুকুরের জল খাওয়া হচ্ছে ?"

তরঙ্গিণী বেজার গলায় বলে, পুকুরের জল খাওয়া হচ্ছে, একথা আবার কে বলতে এলো তোকে ?

তবে পুকুর থেকে জল আনা হচ্ছে কেন ?

'কেন হচ্ছে' সে হিসেব তোকে দিতে হবে ?

হ্যাঁ, হবে। আমি শুনতে চাই কী হয় এই জলে ?

তরঙ্গিণী আচমকা এই ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে, একটু বোধহয় ভয় পেয়ে যায়। তাই আরো বেজার ভাবে বলে—কী আবার হবে ? টিপকলের জলের ডাল সেদ্ধ হয় ?

ডাল সেদ্ধ হয় না !

হলে কী আর বয়ে মরি ? টিপকলের লোহাগোলা জল, ডাল চড়ালে, ডাল লোহার দানা। আর ভাত রাঁধলে ঘোলাটে ম্যাড়মেড়ে।

ফ্যালা কী বুঝলো আর না বুঝলো কে জানে। তবে—তেমনি কড়া গলায় বললো, ঠিক আছে। বাড়িতে যতো ঘড়া বালতি আছে সব বার করে রাখবে। আমি রোজ চান করে ভিজে ধুতি পরে ভরে এনে দেবো। জল আনা নিয়ে একদম চিল্লাবে না বলে দিচ্ছি। মনে থাকে যেন।

বলেই গটগট করে ফিরে গিয়ে আবার পড়তে বসে।

আশ্চর্য এই, তরঙ্গিণী আর 'ধেই ধেই' করে উঠে চেঁচায় না, "লক্ষ্মীছাড়া মুখপোড়া ছোঁড়া, আমার মখে মুখে জবাব ?"

ফ্যালার এই ধরনের রুদ্রমূর্তি দেখে হঠাৎ যেন ঘাবড়ে যায় তরঙ্গিণী।

চোটপাট করে বটে ফ্যালা বরাবরই, তারজন্যেই গাল খায় বেশী বেশী। তবে তাতে তার কিছু এসে যায় বলে মনে হয় না। এরকম রুদ্রমূর্তি দেখেনি কোনোদিন তরঙ্গিণী।

"ওঃ। মনে থাকে যেন।" ক্ষীণভাবে এই কথাটি বলে, ঘড়াটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে যায়।

ময়নাপুরে সার্বেকিপুজো বলতে ওই মুখুজ্যেবাড়ি আগে নাকি খুব বোলবোলাও ছিলো। এখন আর তার সিকির সিকিও নেই। ঠাটবাট বজায় রাখতে প্রথার কঙ্কাল মেনে চলা এই পর্যন্ত।

তবু গ্রামের সম্ভ্রান্ত জনেরা মহাষ্টমীর অঞ্জলিটি এই বাড়ির প্রতিমাকে দিয়ে থাকেন। বাকি প্রায় সকলেই 'সর্বজনীনে'।

হ্যাঁ, সর্বজনীন আছে বৈকি দুটো। একটা 'ময়নাপুর তরুণ সঙ্ঘ', একটু দীনহীন গোছের। আর একটা 'নেতাজী সুভাষ পাঠাগার'-এর সেটি মোটামুটি বেশ জমজমাট। তা বলে কী আর শহর-বাজারের মতো ? ময়নাপুরের মতোই। তবে ছেলে-ছোকরারা প্যাণ্ডেল খোলা পর্যন্ত ওখানেই পড়ে থাকে।

ফ্যালাও এতোকাল তাই থাকতো। তবে এবারে ফ্যালার 'তপস্যা' চলছে। তাই ফ্যালার সেই উদ্দামতা নেই। তবে ফ্যালার মা-ই একটু হেসে হেসে বলেছে, মন দিয়ে লেখাপড়া করতে বলেছি বলে কী পুজোয় একটুও আমোদ করবি না ? পাগলা ছেলে। চারটে দিন পড়ায় ছুটি কর। যেমন আমোদ-আহ্লাদ করতিস করগে। তবে—ওই আসল দিনে 'মহাষ্টমীর' অঞ্জলিটি ওই মুখুজ্যেবাড়ির ঠাকুরদালানে গিয়েই দিবি। ঘোষালবাড়ির সবাই বরাবর ওখানেই অঞ্জলি দেয়।

ঘোষালবাড়ির সবাই দেয়। তাহলে ফ্যালাকেও তো তাই দিতে হবে।

আর তুমি ?

মা একটু দুঃখু দুঃখু হেসে বলছিলো, দ্যাখ না কাণ্ড, তোর বাবা বলে দিয়েছে, "এবার উপোস চলবে না। অতটা হেঁটে গিয়ে

অঞ্জলি দেওয়াও চলবে না।" কিছুই হতো না। আস্তে আস্তে যেতুম। পুরো উপোস না করে একটু জল খেতুম। তো আগে থেকে নিষেধ।

ফ্যালার তাই আমোদ-আহ্লাদেও তেমন মন নেই। মা ঠাকুর দেখতে পাবে না! তবে আর প্রাণে সুখ কী!

সেও ক্ষুণ্ণভাবে বলে, নতুন কাপড়ও পরবে না?

আহা, তা কেন পরবো না? দেখিস তোর মা আলতা-সিঁদুর নতুন শাড়ি-টাড়ি পরে—দুগ্‌গাটি সেজে এই দালানে বসেই মনে মনে দুগ্‌গার অঞ্জলি দেবে! একটু নির্মাল্য আনিস আমার জন্যে।

ফ্যালা জোর গলায় বলে, শুধু নির্মাল্য কেন? দেখো কীরকম ভালো 'পেসাদ' নিয়ে আসবো তোমার জন্যে। বাদলা বলছে, 'পাঠাগার' রাত থেকে বোঁদে ভাজাচ্ছে, কর্মীদের স্পেশাল এক সরা করে দেবে। গোড়ার দিকেই হাতিয়ে নিয়ে চলে আসবো।

সুষমা অবাকমতো হয়ে বলে, কাদের জন্য বললি?

কর্মীদের গো কর্মীদের। আমি ওদের কর্মী নই?

তাই বুঝি? কী কী কর্ম করিস? এটা তো শুনলুম বোঁদে হাতানো।

মা হেসে ফেলে!

ফ্যালা তাকিয়ে দেখে। হাসলে মাকে কী সুন্দর দেখায়। এখন তো শরীর খারাপ, তবু হাসতেই মুখে যেন আলো ফুটে উঠলো।

ফ্যালা উঠোনে নেমে পড়ে, "আহা! কতো কাজ করি। ওদের শুধিও—" বলে সেই আলোটুকুর আলো মনে মেখে নিয়ে মুখুজ্যে-বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।...

খুব 'ড্যাডাং ড্যাডাং' বাদ্যি বাজছে। ঢাক-ঢোল। ঘণ্টা-কাঁসর। অন্য ঘটাপটা কমে এলেও, এই ঢাকিরা ঠিক এসে পড়ে, আর—ঢাকের বাদ্যিতে পাড়া মাথায় করে। তা হোক, এই বাদ্যিটাই বুকের মধ্যে 'গুরগুরিয়ে' জানিয়ে দেয়, 'পুজো হচ্ছে।...পুজো হচ্ছে'।

তবে একটা দৃশ্যে ফ্যালার বরাবরই মন খারাপ হয়ে যায়। ওই

যে ছাগলগুলো বেঁধে রেখে কচি কচি পাতা মুখে ধরে দেয়, তবু তারা কেমন যেন কাতর কাতর ভাবে 'ব্যা ব্যা' করে, ওইটাই বড্ড বিচ্ছিরি। ঠাকুর-দেবতার নিন্দে করতে নেই, তবু ফ্যালা মা দুগ্গোকে এই জন্যে একটু নিন্দে করে।

বলিদান কেন? অ্যাঁ? প্রাণে মায়া আসে না ফল মিষ্টি খিচুড়ি পায়েস, কতো রকম তো ভোগ হয় বাবা। তবু—

সর্বজনীনে অবশ্য এসব নেই।

তাই ওখানে গিয়ে মনটা ভালো হয়ে যায়।

'পাঠাগারে' এসে আরও একবার অঞ্জলি দিলো ফ্যালা, 'মা দুগ্গা, মাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দাও' বলে। তবে 'প্রসাদ বিতরণের' দেরী আছে দেখা যাচ্ছে।...তা হোকগে, এইখানেই ফ্যালার যত বন্ধুরা সবাই এসে জুটেছে। আড্ডায় জমে যাওয়া গেলো।

তবে সবাই একহাত নিচ্ছে, "কীরে ফ্যালা, ছুটির সময়ও যে তোর টিকি দেখা যায় না।...ডুমুরের ফুল হয়ে গেছিস দেখছি।...জজ-ম্যাজিস্ট্রেট না হয়ে ছাড়বি না কেমন?...হোস বাবা হোস। আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবো আর বলবো, সেই আমাদের 'ফ্যালা ফ্যালা মাটির ঢ্যালা'. হি-হি-হি, আজ কী একখানা হয়েছে দ্যাখ সবাই।

বাজে বকিস না তো। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া অতো সোজা? তার থেকে সবাই মিলে সত্যি সোজা কাজটা করিগে চল।

সত্যি সোজা কাজটা? সেটা আবার কী রে?

কী বুর্জলি না? একটু বেশী করে বোঁদে হাতানো। পেসাদ বিলোনোর চার্জে কে আছে রে?

কে আবার। নিমাইদা। শক্ত ঘাঁটি।

ফ্যালার কাছে সব শক্তই নরম হয়ে যায়। দেখিস।

নিজের ভাগ্যের ওপর এতো আস্থা কেন ফ্যালার? তার জীবনে কী 'প্রাপ্তির' এতো কিছু সমারোহ দেখেছে ফ্যালা? কী জানি। তবু ফ্যালা যেন নিশ্চিত জানে, নিমাইদা তাকে দেখেই হাসিমুখে বলবে, "এবারে কিন্তু খুব ফাঁকি দিলি ফ্যালা। তোর দেখাই

পাওয়া যায়নি। তো—ঠিক সময়টিতে ঠিক হাজির।''...বলে, তাকে দেবার সরাটায় চেপে চেপে বোঁদে ভরবে, আর তাড়াতাড়ি কলাপাতার টুকরোটা চাপা দিয়ে হাতে ধরিয়ে দেবে. পাছে আর কেউ মাপটা দেখে ফেলে।

কিন্তু আজ ফ্যালার অংকটা মিললো না।

প্রসাদ বিতরণের টাইম আসার আগেই নিমাইদা একে ওকে ঠেলে সরিয়ে ফ্যালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পাথর পাথর মুখে, বরফ কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'ফ্যালা! এক সেকেন্ডও দেরী না করে তুমি এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও!'

গলার শব্দটা এতো ঠান্ডা কেন নিমাইদার!

ফ্যালার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যায়। ফ্যালার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারিত হয়, ক্যানো?

ঠিক আগের মতো স্বরেই নিমাইদা উত্তর দেয়, বাড়ি থেকে খোঁজ করতে এসেছিল। তাড়াতাড়ি চলে যাও। যতো তাড়াতাড়ি পারো!

ফ্যালা কী খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসতে পেরেছিল?

ফ্যালা জানে না। ফ্যালার হাঁটুটায় কেন জোর আসছিলো না তাও জানে না।...তবু হয়তো ফ্যালা ছুটে ছুটেই এসেছিলো।

নিমাইদা অমন গম্ভীর ভাবে কথা বললো কেন? ফ্যালা কী না জেনে কোথাও কোনোখানে খুব একটা দোষ করে ফেলেছে, তার শাস্তি দেবার জন্যে ডাক পড়েছে ফ্যালার?

তা না হলে এতো ভয় করছে কেন?

ভেতরটা বরফের মতো ঠান্ডা হিম লাগছে কেন?

কী দোষ করেছে? কখন?

দরজার কাছে এসেই হকচকিয়ে গেলো ফ্যালা।

দরজাটা দু'হাট করে খোলা কেন?

ডাক্তারবাবু উঠোনের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে কেন? উঠোনে আরো কারা সব ঘোরাঘুরি করছে কেন?

আর দাওয়ার ওপর ?

ও কিসের দৃশ্য ?

দাওয়ার ওপর শুয়ে কে ? মাদুরে না মাটিতে !

তার চারধারে বাড়ির সব্বাই বসে কেন ? বাবা, ওভাবে কাকে কী বলছে ?

ফ্যালা এসে ঢুকতেই অনেকের কণ্ঠ থেকে একটাই শব্দ বেরোলো, "এসে গেছে !"

ফ্যালা শুনতে পেলো বাবা বলছে, "ফ্যালা এদিকে এসে বোসো। তোমার মা চলে যাচ্ছেন।"

চলে যাচ্ছেন !

চলে যাচ্ছেন মানে ? কোথায় যাচ্ছেন।

ফ্যালা তো চেঁচিয়েই উঠেছিলো, কিন্তু সেই স্বর কেউ শুনতে পেলো না। অথচ ফ্যালা আরো চেঁচিয়ে বলে চলেছে, মা হাঁটতে পারে ? তাই চলে যাবে ?

অথচ মায়ের সাজসজ্জা তো কোথাও বেড়াতে যাবার মতোই। মার পরনে চওড়া সুন্দর পাড় শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে লাল টিপ। শুধু টিপটা কেমন ঘষটে গিয়ে বাঁকাচোরা মতো !···বালিশে ঘষটে গেছে তাহলে।

ফ্যালার এতো চেঁচিয়ে বলা কথা কারো কানে ঢুকছে না কেন ?

বাবা বললো, সরে এসো ! 'মা' বলে ডাকো তো দেখি, সাড়া আসে কিনা !

তারপর বাবা নিজেই কেমন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠলো, বড়বৌ। ফ্যালা এসেছে। তাকিয়ে দ্যাখো !

ফ্যালাই তখন তাকিয়ে দেখে।

মার বুকটা ভীষণ ওঠাপড়া করছে। মার বোজা চোখের দুপাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে !

সেই বোজা চোখ দুটো আস্তে খুললো।

ফ্যালা শুনতে পেলো, বাবা খুব শান্ত গলায় বলছে, "যাবার সময় একটা মিথ্যের বন্ধন নিয়ে চলে গেলে শান্তি পাবে না সুষমা ! সে বন্ধন থেকে মুক্ত হও।"

ফ্যালা চমকে উঠলো।

দেখলো তার নিথর হয়ে শুয়ে থাকা মা হঠাৎ সারা শরীর বাঁকিয়ে প্রায় উঠে বসলো। ভয়ঙ্কর একটা ফাটাচেরা মতো গলায় বলে উঠলো, 'মিথ্যের বন্ধন'! ওঃ। ফ্যালা! তাহলে সত্যি কথাটা আমার মুখ থেকেই শুনে নে। তাই হুকুম।··তুই এখানের কেউ নয়, এ বংশের কেউ নয়, এ সংসারের কারুর নয়। আমি তোর সত্যিকার মা নই। আমি শুধু—আমি শুধু—

মা!

ফ্যালা বিচ্ছিরি রকমের চেঁচিয়ে উঠে বলে, এখনো তোমার সেই ঠাট্টা।

মা আরও একবার শরীরটাকে তেমনি ঝাঁকিয়ে, চেরাফাটা গলায় হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলে, ঠাট্টা নয়। সত্যি। তিন সত্যি। তোর সত্যিকার মা—মহারানীর মতো মা, তোকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে—ফেলে দিরে—

আবার লটকে শুয়ে পড়ল মা।

কিন্তু শুয়ে পড়ার পর কী করলো মা, তা কী বুঝতে পেরেছিলো ফ্যালা?

কী করে পারবে? ঠিক সেই সময়ই তো এই দালান উঠোন গাছপালা সমেত সব দুলে উঠে তোলপাড় করা ভূমিকম্পটা হলো। যাতে ফ্যালার মনে হলো—ওর দাঁড়ানোর জায়গাটায় মাটিফাটি কিছু নেই, ফাঁকা গর্ত হয়ে গেছে। আর ফ্যালা সেই গর্তর মধ্যে তালিয়ে যাচ্ছে।···

ভীষণ ভয় পেয়ে ফ্যালা কিছু ধরতে চেষ্টা করলো। হাত বাড়ালো। হাতের কাছে কিছু পেলো না। তবু সেই ভয়ের কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করলো!···তারপর আর জানে না! সব ঝাপসা!

ফ্যালার যখন চেতনা এলো, দেখতে পেলো কতকগুলো লোক ফ্যালার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে, আর কী যেন বলতে বলতে ফ্যালাকে ধরতে আসছে।···ফ্যালা যতো ছোটে, তারাও ততো ছোটে!

কিন্তু ছুটে ফ্যালাকে ধরে ফেলতে পারে এমন কে আছে এই ময়নাপুর গ্রামে? ছুট মারতে মারতে ফ্যালার চোখের আলো মুছে গিয়ে সব ঝাপসা হয়ে গেলো মুখে ফেনা উঠতে লাগলো, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। তারপর বসে পড়লো। তবে নিশ্চিন্দি হয়েই বসে পড়লো। আর কেউ ধরতে আসছে না। বহুদূরে মিলিয়ে গেছে তারা।

এই জায়গাটা কী? যেখানে বসে পড়েছে ফ্যালা।

এটা তো ঠিক রাস্তা নয়। এবড়ো-খেবড়ো একটা ধুধু করা মস্ত মাঠ। রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে।···কতোখানি যেন পেরিয়ে এসেছে ফ্যালা, তবু সামনে অনেকখানি। এতোবড়ো মাঠের মধ্যে একটাও ছায়াওলা গাছ নেই। ফ্যালা বসে পড়েছে একটা খেজুরগাছের তলায়। কিন্তু খেজুরগাছ কী ছায়া দেয়?

ফ্যালা ভাবতে চেষ্টা করে, সে এখানে কেন?

কী জন্যে এসেছে এখানে। কোথা থেকে এসেছে। ফ্যালার পিছু পিছু যারা তাড়া করে আসছিলো তারা কে? কেন ফ্যালাকে ধরতে আসছিলো?

ফ্যালা সেই ধুলোমাটির ওপর শুয়ে পড়লো। চোখ বুজলো। ওর বোজা চোখের সামনে ভাঙাচোরা কতকগুলো দৃশ্য এলোমেলো-ভাবে ফুটে ফুটে উঠছে। · কোনখানে যেন কটা ছাগলছানা বাঁধা। সামনে কচি কচি পাতা, তবু তাতে মুখ না দিয়ে তারা কীরকম যেন কান্না কান্না গলায় 'ব্যা ব্যা' করে ডাকছে। ওদের সামনে ঠাকুর-দালানে দুর্গা মূর্তি!

আরো কোথায় যেন মা দুর্গার মতো দেখতে একজন হঠাৎ কী করে যেন ওই ছাগলছানাদের দলে মিশে গিয়ে গুলিয়ে গেলো। কান্না কান্না স্বর · ক্রমে ঝাপসা হয়ে গেলো। ঢাকঢোলের শব্দগুলো ক্রমেই ঝিমিয়ে মিলিয়ে এলো।··একসময় খেজুরগাছের সামান্য ছায়াটুকুও সরে যেতে যেতে—ফ্যালাকে একেবারে সূর্য্যিঠাকুরের রোখাচোখা চোখের তলায় সমর্পণ করে পুরো সরে পড়লো।

ফ্যালা টের পেলো না।

এই মাঠটা হাটে যাবার শর্টকাট পথ।

হাটুরেরা না হলেও—হাটের কেনাকিনির খদ্দেররা কেউ কেউ এই মাঠ ভেঙে চলে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরস্পরে বলাবলি করে হাসলো, "কী আকাট ঘুম দেখো ছেলেটার! মুখে চড়চড়ে রোদ এসে পড়েছে, ঘেমে অ্যাকসা, তবু হাঁ করে ঘুমাচ্ছে!"

কেউ কেউ দু'একবার ডাকলো, "এই ছেলে, এতো রোদে ঘুমাচ্ছো ক্যানো?"

ঘুমন্তর কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না।

থমকে দাঁড়ালো দু'একজন।

শুধু ঘুম? না চিরঘুম রে?

দূর। দেখছিস না বুকটা ওঠাপড়া করছে।

এই বয়েসেই মালটাল খায়নি তো?

ধ্যাত! দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্দরঘরের ছেলে। সাজসজ্জে মন্দ না। অসুখ-বিসুখ করে নাই তো?

তেমন মানবিক গুণসম্পন্ন কেউ কেউ কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখলো একটু।···সাড়া নিতে চেষ্টা করলো। তারপর হয়তো সঙ্গীর তাড়নায় আর দাঁড়াল না। কী জানি বাবা, কোথাকার ছেলে এখানে এমনভাবে পড়ে ঘুমোচ্ছ কেন, বেশী কৌতূহল শেষে ফ্যাসাদ ডেকে আনবে।

অতএব ফ্যালা গভীর ঘুমের অতলে পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। আসলে সকাল থেকে পেটে জল পড়েনি, অঞ্জলি দেবে বলে নিরম্বু ছিলো। তারপর ওই বিরাট ভয়ের ধাক্কা আর প্রচণ্ড ছোটার পরিশ্রম। এটাকে ঘুম না বলে 'অচেতন' অবস্থা বললেও বলা যায়।

সময়ই সবকিছুর নিয়ামক।

কোনো একসময় সূর্যিঠাকুর ডিউটি সেরে ঘরে ফিরে যাবার কালে, যথারীতি তাঁর উড়ুনিতে বাঁধা ভোর সকালের উদ্বৃত্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়াটুকু উড়ুনির গিঁট খুলে ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

গাছের পাতারা শনশনিয়ে উঠলো, নিঝুম প্রকৃতি যেন ঝিমুনি ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

ফ্যালার চেতনা ফিরে এলো।

ফ্যালার হঠাৎ মনে হলো, তার মশা-কামড়ানো ডুমো ডুমো গা টায় মা অতি আস্তে হাত বুলোচ্ছে।

তাহলে কী মাঝখানে যা সব হুড়োহুড়ি কাণ্ড দেখছিলো সে সব স্বপ্ন ?···ফ্যালা সেই যেমন ছিলো তেমনিই আছে ? ফ্যালা চোখ খুলতে গিয়েও খুললো না। কোনটা স্বপ্ন পরীক্ষা হোক ?

কিন্তু সেই পরীক্ষার ফল জানতে বেশীক্ষণ সময় দিতে পারা গেলো না। ফ্যালা আস্তে উঠে বসলো।

শেষ আশ্বিনের পড়ন্ত বেলার স্নিগ্ধ হাওয়ায় গা জুড়িয়ে গেলো। ফ্যালা চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো।

কোথায় এসে পড়েছে, বুঝতে পারছে না। যদিও এই পড়ন্ত বিকেলের চেহারাটা ময়নাপুরের থেকে খুব তফাত নয়।

ফ্যালা কেন অমন ছুটতে শুরু করেছিলো ?

সেটা ভাবতে গিয়েই ফ্যালা আবার একটা গভীর অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে।

ফ্যালা যদি ময়নাপুরের ঘোষালবাড়ির ফ্যালা না হয়, যদি 'দ্বারকেশ্বর স্মৃতি বিদ্যালয়'-এর ক্লাশ সেভেন-এর ছাত্র ষষ্ঠিচরণ ঘোষাল না হয়, যদি ভুবন ঘোষাল সুষমা ঘোষাল নামের দুটো অস্তিত্বের সঙ্গে ফ্যালার কোনো যোগসূত্র না থাকে, ফ্যালা তবে কে ?

'আমি কে' ? এইটা না জানতে পারা কী ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ? অথচ আজ সকাল পর্যন্তও ফ্যালা জানতো সে 'কে' !

সেই জানাটা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যালার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। এখন ত্রিভুবনে ফ্যালার কেউ নেই, কিছু নেই। ফ্যালা এইমাত্র একটা অজানা অচেনা কোনো জগৎ থেকে খসে পড়ে এইখানে বসে আছে। সে ফ্যালাও নয়, ষষ্ঠিচরণও নয়, কেউ নয়।

এখন কী হবে ?

ফ্যালা এখন কী করবে ? যে মানুষটা ঘণ্টা কয়েক আগে ফ্যালার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিঃস্ব করে দূর করে দিয়েছে, ফ্যালা কী

তার জন্যেই ডুকরে কেঁদে উঠবে ? কিন্তু ময়নাপুরের ঘোষালবাড়ির বড়বৌ সেই সুষমা ঘোষাল যদি তারপর মরেই গিয়ে থাকে, এই 'কেউ না' লোকটা কাঁদতে বসবে কেন ?

জোর করে নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করলো ওই 'কেউ না' লোকটা বা ছেলেটা। কিন্তু পেরে উঠলো না।···সেই ঘোষালবাড়ির দাওয়াটায় পেঁছে গিয়ে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কতোক্ষণ কে জানে।

হঠাৎই একসময় ভাবতে বসলো। ভাবতে চেষ্টা করলো—সেই মানুষটা যদি ফ্যালাকে এমন সর্বস্বান্ত করে 'কেউ নয়' করে ছেড়ে না দিতো, তাহলে ফ্যালাকে এখন কী করতে হতো ?

সেই ভালোবাসায় গড়া সুন্দর মুখটায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে হতো ? চিতায় কাঠ চাপিয়ে সেই চিরচেনা দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে ছাড়তে হতো ?

তারপর বিচ্ছিরি একটা সাদা ন্যাকড়ামতো কী পরে, ফিরে আসতে হতো সেই শূন্য দাওয়াটায় !

এইরকমই তো দেখেছে ফ্যালা, কদিন আগে তার প্রাণের বন্ধু স্বপনের ব্যাপারে।···স্বপন বলেছিলো, "ভাবা যায় না কারা এইসব নিয়ম সৃষ্টি করেছিলো ! কেউ মরে গেলে তার সবচেয়ে ভালোবাসার, সবচেয়ে আপনজনকেই মুখে আগুন দিতে হয়। কী ছোটোলোকী নিষ্ঠুর নিয়ম বল তো ? বুক ফেটে যায়।"

তা হঠাৎ 'কেউ নয়' হয়ে যাওয়ায় ফ্যালাকে তাহলে আর সেই নিষ্ঠুর নিয়মটার আওতায় পড়তে হলো না ! এটা তাহলে একরকম শান্তি।

কিন্তু তবু ওই 'কেউ নয়' ছেলেটার বুক ফেটে যাচ্ছে কেন ?

আশ্বিনের বেলা, সূর্যাস্ত হতে না হতেই ছায়া নেমে আসে পৃথিবীতে। এখানে আর এভাবে বসে থাকা চলবে না। ফ্যালা উঠে পড়লো। দেখলো কোঁচাটা আলগা হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। পুজোয় পাওয়া সুন্দর ফুলপাড় নতুন ধুতির কোঁচাটা, মা—না !

না ! ওই বাড়ির সেই বড়বৌ আগে থেকে থেকে কুঁচিয়ে দিয়েছিলো ! ছোটার ফলে লাটঘাট হয়ে গেছে।

সেই বড়বৌ যার নাম সুষমা ঘোষাল, সে বলতো, "পুজোয় যতই ভালো পোশাক কেনা হোক, অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাবার সময় একটা ধুতি-পাঞ্জাবি না পরলে মানায় না !'

সেই মানানোটাকে এখন এঁটেসেটে বাগিয়ে নিতে হচ্ছে ফ্যালাকে। নেবার পরই ফ্যালা একটা ভয়ঙ্কর 'সত্য' আবিষ্কার করে বসে।

ভয়ঙ্কর তেষ্টা পেয়েছে তার। আর ভয়ঙ্কর খিদেও।

কোনোমতে পা টেনে টেনে এগোতে এগোতে ফ্যালা আবার থমকে গেলো। কোথা থেকে যেন কাঁসর ঘণ্টা আর ঢাকঢোলের শব্দ আসছে। ফ্যালা কী তাহলে উল্টোপথে হেঁটে যাবার সেই মুখুজ্যেবাড়িতে চলে এসেছে ?

না তো, সেখানে এতো আলোর সমারোহ হয় না।

তাহলে কী তাদের 'পাঠাগার-এর' প্যাণ্ডেলে চলে এসেছে ?

কিন্তু এতো আলো ? টিউবলাইট দিয়ে রেলিং বানানো। ফ্যালা কোনোমতে এগিয়ে এসে সামনের ব্যানারটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

ঠিক তাদের পাঠাগারের মতোই লাল শালুর ওপর সাদা তুলোর থোপা সেঁটে সেঁটে লেখা—'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-বসন্তবাগান সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব।

'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'। সে তো ফ্যালাদেরই—না না, নিমাইদাদের ময়নাপুরও। 'বসন্তবাগান'টা কোথায় ? কোনদিকে ?

ফ্যালা (মনে মনে যে এখন নিজেকে 'কেউ না' বলতে শুরু করেছে) সেই প্যাণ্ডেলের গেটের কাছে জটলার মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

ভিড়ে ঠেলাঠেলি সাজাগোজা নারী-পুরুষ ছেলেপুলে আরতি দেখতে এসেছে।…কিছুক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু যখন ওই কাঁসরঘন্টার শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত মাথায় নিয়ে ফ্যালা এদিকে সরে এসে, একটা পড়ে থাকা সরু কাঠের বেঞ্চেয় এসে বসে পড়েছে, কে একজন এসে বলে উঠলো, "তুমি কে ভাই ? চিনতে পারছি না তো ?

কোন্ পাড়ার ?"

ফ্যালার গলা শুকিয়ে কাঠ। ফ্যালা তাকিয়ে দেখে নিমাইদা না কী।...নাঃ, তবে অনেকটা যেন নিমাইদার মতোই। 'সার্বজনীন পুজোয়' এরকম নিমাইদা প্যাটার্নের থাকেই এক-আধজন।

ফ্যালা বললো, বলছি। আগে একটু জল খাবো।

'একটু জল দিতে পারেন'...বা 'একটু জল দিন' বলবার সৌজন্য এলো না এখন ফ্যালার, তাই বলে উঠলো, "আগে একটু জল খাবো।"

কিন্তু আসবেই বা কী করে? ফ্যালা কবে তেমন সৌজন্যর ধার ধেরেছে? পাড়ার লোকের কাছে জ্ঞানাবধিই ফ্যালা 'ফ্যালা' 'তুই'। তাদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা সৌজন্য কিসের? কিন্তু সেটা কোন পাড়া?

এখানের নিমাইদা বলছে, "চিনতে পারছি না তো ভাই। কোন পাড়ার ?"

ফ্যালা কোন পাড়ার নাম করবে? অ্যাঁ? ফ্যালা কী আর এখন কোনো পাড়ার?...ফ্যালার নিজের কোনো পাড়া নেই। ফ্যালা চুপ করে থাকে।

এখানের এই নিমাইদা কাকে ডেকে কী যেন বলেন। একটি ছেলে এসে দাঁড়ায়। তাকে কী বলেন, সে মাথা নেড়ে কী যেন জানায়। ইনি বলেন, "ঠিক আছে! বাড়ি থেকেই নিয়ে আয়। বড় গেলাসে।"

ফ্যালার মাথা ঝিমঝিমিয়ে আসছে।

এতোটি বয়েসে ফ্যালা কবে এমন নির্জলা উপোসে থেকেছে?

হঠাৎ ফ্যালার মনে হলো, আজ কী আমার জল খেতে আছে? মা মারা গেলে কী খায় কিছু?

কিন্তু কার মা? ফ্যালার মা তো ফ্যালাকে কোন শৈশবে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।...কী অপমান। কী লজ্জা!...

একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে একটা কলাপাতা পাতা ছোট্ট মাটির সরায় কিছু কাটা ফল আর কোনো একটু মিষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে একটা ছেলে, তার হাতে একটা গেলাস আর একটা জগ।

'নিমাইদার মতো' জন বলেন, গুড। বুদ্ধি হ্যাজ!...এই যে ভাই, জল খাও।...কী হলো? শরীর খারাপ লাগছে না কী?... অনেক দূর থেকে আসছো মনে হচ্ছে। সারাদিন বোধহয় নাওয়া-খাওয়াও হয়নি। আচ্ছা সেকথা পরে হবে। জল খাবার আগে ওদিকে সরে গিয়ে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে নাও।

ফ্যালা মেয়েটির হাতের দিকে তাকিয়ে একটু জোর দিয়ে বলে, আমি তো শুধু একটু জল খাবো বলেছি।

'নিমাইদার মতো' একটু হেসে বলেন, 'বা, পুজোর দিন শুধু জল খাবে? একটু প্রসাদ খাবে না?

ফ্যালার মনে হলো সে যেন স্বর্গলোকে এসে পেঁছে গেছে। মুখে-চোখে জল না দিয়েও শরীর জুড়িয়ে গেলো। জল না খেয়েই তেষ্টা ভেঙে গেলো। তবু ওনার কথামতো চোখে মুখে জল দিয়েও নিলো এবং প্রসাদের পাত্রটা হাতে নিলো। কিন্তু? কিন্তু— একটুকরো কাটা ফল মুখে দিয়েই কলাপাতার টুকরোটা সরিয়ে নীচে কী আছে দেখতে গিয়ে ফ্যালা হঠাৎ সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে ছিটকে উঠে, 'এটা কে দিতে বলেছে? এটা কে দিতে বলেছে —' বলে পাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিড়ভাট্টা ঠেলতে ঠেলতে চলে গেলো আর পিছনে না তাকিয়ে। কাটা ফলের টুকরোর সঙ্গে মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো কতকগুলো বোঁদে।...যেটা সকালের প্রসাদের দরুন ওই মেয়েটাদের বাড়িতে ছিলো।

সবাই থতমত। নিমাইদার মতো জন অবাক হয়ে বলেন, "কী হলো বল্ তো?"

ছেলেটার দুহাত জোড়া। তাই হাত উল্টে 'কী জানি' বলবার বদলে ঠোঁট উল্টে বললো কথাটা। আর মেয়েটা হঠাৎ একটু ফিক্ করে হেসে ফেলে বললো, "পাগলা—"

উল্টোপাল্টা আচরণ দেখলেই তো লোকে তাকে বলে 'পাগল'।...

যাদের নিজের কাছে অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, নাম নেই, পরিচয় নেই, তার ওপর সবাই একটা স্ট্যাম্প মেরে দেয় 'পাগলা'।

ফ্যালার ওপরে কী তবে এখন থেকে সেই স্ট্যাম্প মারা হবে?

আচ্ছা কখন ফ্যালাকে ওই একটা বাস টার্মিনাসের ধারের চায়ের দোকানের সামনে দেখা গেলো ?

ফ্যালার পরনে এখন সেই ফুলপাড় ধুতিটা, যেটা ময়লা চিরকুট্টি হয়ে গেছে, সেটা পাট করে লুঙ্গির মতো করে পরা। পাঞ্জাবিটার বোতামগুলো খোলা। বুকটা দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য মুখের থেকে বুকটা কতো ফর্সা।

দেখা যাচ্ছে—চায়ের দোকানের মালিক বললো, তুই আবার কে রে ? তোকে তো এখানে কখনো দেখিনি।

লোকটাকে হঠাৎ পবন ঘোষালের মতো মনে হলো ফ্যালার আর 'স্বভাব যায়না মলে', কথাটার ষোলো আনা যথার্থতা প্রমাণ করে ফ্যালা বলে উঠলো, পৃথিবীসুদ্ধু লোককে আপনি চিনে রেখেচো ?

আরে ব্বাস ! এ যে দেখছি কেউটের সন্‌ই। যদি বলি—'হ্যাঁ, চিনে রেখেছি !'

বললেই তো হয় না।

তো বেশ বাবা, না হয় হয় না। বলি আসছিস কোথা থেকে ?

কোনো একখান থেকে।

বাহারে মেরা বাহাদুর। তো নাম কী ?

নাম নাই।

বাড়ি কোথায় ?

বাড়ি নাই।

নাম নেই ? বাঃ বাঃ বা ! বলি এখানে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছিস কেন ?

ছোঁক ছোঁক মানে ? আনসান কথা বলবে না বলছি !

দোকানের মালিক হ্যা হ্যা করে হেসে কাকে যেন ডাক দিয়ে বলে, ওরে রামপদ, শোন শোন মজার কথাটা। এই মহাপ্রভুটির 'নাম নাই' 'বাড়ি নাই'···এখানে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছিস ক্যানো শুধোতে একেবারে 'ফায়ার' !

রামপদ দোকানের ভিতরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে দেখে বলে ওঠে, ওঃ। কালকের সকালের বাজারের সেই পাগলাটা। 'তুই কে ?' জিগ্যেস করলেই ক্ষেপে গিয়ে বলছিলো 'কেউ না' !

তা যে মানুষটা ক্ষ্যাপালে ক্ষ্যাপে তাকে ক্ষ্যাপাতে ইচ্ছে কার না হয় ?

তাই দোকানের মালিক বলে, ছোঁক ছোঁক করছিস না ? তা ভালো। তো একটা কিছু তো করছিস ? কী করছিস ?

ঠিক। ঠিক পবন ঘোষালের মতো।

ফ্যালার মনের মধ্যে আক্রোশ জ্বলে ওঠে। ফ্যালা অবজ্ঞার সুরে বলে, কিছু যে একটা করতেই হবে তার মানে আছে কিছু।

তা—হ্যাঁ হ্যাঁ, নবাব বাদশা রাজারাজড়ার ঘরের ছেলে হলে অবিশ্যি কিছু করতে হয় না। তা রাজপুত্তুর সঙ্গে চাকরবাকর নেই যে ? গাড়িঘোড়া নেই যে ? রামপদ, দেখেছিস ? একখানা রাজপুত্তুর।

ঠিক। ঠিক সেই রকম। অকারণ অসভ্যতা। অকারণ অপমান করার চেষ্টা।···ফ্যালা গম্ভীরভাবে যলে "সব ছোটলোকের একই ধারা।"···বলে গটগট করে চলে যায়।

ফ্যালাকে আবার দেখা যায়, একটা পুরনো কালের কালী-মন্দিরের কাছে। যেখানে মন্দিরের পৈঠেয় একজন ফুল আর মালা বিক্রি করছে।

শুকনো শুকনো কিছু বেলপাতা, মরা মরা কিছু জবার মালা, আর কিছু ঝুরো ফুল। বিছিয়ে রেখেছে একখানা মান পাতার ওপর।

ফ্যালা সেখানে এসে দাঁড়িয়েই তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, এসব ফুলপাতা কদিনের বাসি ?

লোকটা রেগে উঠে বলে, বাসি মানে ?

বাসি মাসে বাসি। তার আবার আলাদা মানে আছে না কী ? তো কতোদিনের ? কালকের ? না পরশুর ? শুনি।

লোকটা আরো রেগে বলে তুই কে রে ছোঁড়া ? তাই তোকে জবাব দিতে যাবো ? তুই কী মালা কিনে মাকে চড়াতে যাবি ?

ফ্যালা বললো, আমার সে ইচ্ছে হলে, কিনতে দায়। ভগবানের রাজ্যে গাছে গাছে কতো ফুল !

ওঃ! ভ্যালারে মোর বাপ। পরের বাগানের ফুল চুরি করে মাকে টাটকা মালা দেওয়ার কারবার।

ফ্যালা তীব্র গলায় বলে, 'চুরি' আবার কী? গাছপালা জল-হাওয়া সবই ভগবানের! তাঁর জিনিস তাঁকেই দেওয়া।

খুব শাস্তর শিখেছিস যে। যা ভাগ!

কেবল কেবল 'তুই তুই' করচো যে?

তবে কী আপনি আজ্ঞে করবো?

ফ্যালা কিছু বলবার আগেই একজন মহিলা কাছে এসে দাঁড়ান। চওড়া লালপাড় গরদ শাড়ি পরা, তেমনি লাল টুকটুকে জামা গায়ে, কপালে বড় লাল টিপ। ঘাম ঘাম মুখ! হাসি হাসিভাবে বলেন, "জবার মালা আছে?"

ফ্যালা কেমন বিহ্বলভাবে তাকায়।

একেই কী মহারানীর মতো বলে?

লোকটা তাড়াতাড়ি বলে, আছে বৈকি আজ্ঞে। টাটকা মালা আছে।

ফ্যালা তো বলে উঠতে পারতো, "আছে। তবে পরশুর টাটকা!"

কিন্তু বলা হলো না।

ফ্যালা শুধু তাকিয়ে থাকলো।

দেখলো মহিলা শালপাতায় মোড়া ফুল আর মালা নিলেন, পয়সা দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠে সামনের নাটমন্দিরের থামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এখানে যে অন্য একটা মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকিয়েও দেখলেন না।

কেন কে জানে ভীষণ একটা অভিমান হলো ফ্যালার।

ও ওই দোকানীটার দিকে আর না তাকিয়ে মন্দিরচত্বর থেকে বেরিয়ে এলো!

কার ওপর অভিমান, কিসের অভিমান তা জানে না ফ্যালা।

মন্দিরের বাইরে খানিক দূরে একটা বড় পুকুর। বোধ হয় দেবপুকুরই। কারণ পুকুরের জল শ্যাওলা গোলা ঘোলা ঘোলা। পুকুরে নামার সিঁড়িগুলো শ্যাওলায় হড়হড়ে আর পুকুরের জলে

ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু বাসি মালা ফুল বেলপাতা। মন্দির-মার্জনের জঞ্জালই বোধ হয়।

ফ্যালা একটু পাশের দিকে একটা শুকনো সিঁড়ি দেখে বসে পড়ে। শীতের হাওয়া বইছে হু-হু করে। শুনতে পাচ্ছে এখানে না কী 'মাঘমেলা' বলে একটা মেলা হবে কদিন পরে।

ফ্যালা আচ্ছন্নের মতো ওই জলে ভাসা পচা বেলপাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে ভাবে ফ্যালার জীবনটাও এখন ওইরকম। ভেসে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কী যন্ত্রণাময় এই জীবন!

ভাসতে ভাসতে যে কুলে ঠেকে, অমনি প্রশ্ন করে ওঠে, নাম কী? কোথা থেকে আসছিস? কোন দেশের ছেলে? বাপের নাম কী? সংসারে কে কে আছে? এমন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

ফ্যালা ফটাফট বলে উঠতে পারছে না, "নাম এই, বাপের নাম এই, দেশের নাম এই, বাড়িতে এরা এরা আছে।" এ কী কম যন্ত্রণা?

কী আশ্চর্য্য! একটা মানুষ কিছুতেই জানতে পারছে না সে কে?

আচ্ছা কেনই বা ফ্যালার সত্যিকার মা ফ্যালাকে ওই ঘোষাল-বাড়ির বড়বউয়ের কোলে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলো?

নাঃ! কিছু জানবার উপায় নেই।

পাথরে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে ফ্যালার।

এ কী গভীর অন্ধকার! কোনোখান থেকে একবিন্দু আলোর ছিটেমাত্র নেই।

আমি জানতে পারছি না আমি কে! আর সেইটা কাউকে বলতে পারি না বলে লোকে হাসে। ঠাট্টা করে। পাগল বলে।

ফ্যালা হঠাৎ কেমন স্থির হয়ে গিয়ে ভাবে, আচ্ছা আমার কী তাহলে নিয়মটা পাল্টানো উচিত?

নিজে নিজে একটা নাম-পরিচয় তৈরি করে নিয়ে সেটাই বলবো?

তাহলে আর লোক হাসবে না।

এই চিন্তাটায় যেন একটু উৎসাহ পায় ফ্যালা।

ওই শ্যাওলা পুকুরে ভেসে বেড়ানো পচা বাসি ফুলমালাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতেই থাকে।···হুহু করা শীতের বাতাস অগ্রাহ্য করে।

এখন চড়া রোদ। তবু এই পুকুরধারে চারিদিকে গাছপালার ছায়া ভেদ করে সে রোদ এসে গায়ে লাগছে না। তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না ফ্যালার।

কিন্তু 'কেউ না' নামের ছেলেটার দিনরাত্তিরগুলো কাটছে কী করে? থাকছে কোথায়? পরনের কাপড়টা-জামাটা তো জীর্ণ দশায় এসে ঠেকেছে। বদলায় কখন?···

সে হিসেব দেওয়া শক্ত।

হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরা যেমনভাবে বেঁচে থাকে, সেই-ভাবেই বেঁচে আছে ফ্যালা।

কিন্তু তাদেরও তো একটা অতীত থাকে। নাম-পরিচয় থাকে। ফ্যালার মতো এমন নিঃস্ব সর্বস্ব হারানো কে থাকে?

অথচ ফ্যালা এগারো-বারো বছর ধরে জানতে, তার একটা কেন, দু দুটো নাম আছে। বংশ পরিচয় আছে। বাড়ি আছে, বাড়ির গ্রাম, জেলার হিসেব আছে। অনেকগুলো আপনলোক আছে। তারপর—হঠাৎ সেই ভূমিকম্পের সময় ফ্যালা জানলো ওসব কিছু নেই তার।···শুধু একজন 'মহারানীর মতো' মা ছিল তার, সে ফ্যালাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

তার মানে খুব অহঙ্কারী।

মন্দিরের ওই জবার মালা কেনা মহিলাটির মতো। তা উনি তো ওই শুকনো শুকনো মালাও পয়সা দিয়ে কিনে গেলো। অথচ ফ্যালাকে—! ফ্যালা কী এতোই অছেদ্দার ছিলো?

ফ্যালার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু ফ্যালা এই পৃথিবীর মাটিতে টিকেও তো রয়েছে।

ফ্যালা পথেঘাটে ঘুরে-বেড়ানো কুকুর-বেড়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, আমি তাহলে এদের মতো? এদেরও

ঘরবাড়ি নাই, মা-বাপ নেই, কে ওদের পৃথিবীতে এনেছে, তা জানা নেই।

ফ্যালাও তো তাই।

রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ফ্যালা এখানে সেখানে কোথাও। ভাবে, মানুষ মরে গেলে নাকি তারা হয়ে যায়। কিন্তু ফ্যালার, সেই 'সত্যিকার মা'। সে যে মরে গিয়ে তারা হয়ে আছে সে কথাটা ভেবে নিয়েও তো স্বস্তি পাবার উপায় নেই ফ্যালার। কে জানে দিব্যি বেঁচে আছে কিনা।

আর ফ্যালার সেই 'মিথ্যে মা'! বোকাহাবা অবোধ ফ্যালা যাকে 'মা' বলে প্রাণ ভরাট করতো 'মা' বলে ভেবে পরম নিশ্চিন্ত সুখে কাল কাটাতো!

...সেই সুষমা ঘোষাল নিষ্ঠুরের মতো ফ্যালাকে সেই চরম বাণী শুনিয়ে দিয়েই যে সটান শুয়ে পড়েছিলো, তারপর কী সত্যিই মারা গিয়েছিলো? বেশী অসুখ করলেই কী সবাই মরে যায়? মরমর হয়েও তো আবার বেঁচে ওঠে কতোজন।

ময়নাপুরের সেই 'স্যাকরাজ্যেঠুর' বাবা! তেনাকে তো একবার 'মরে যাচ্ছে' ভেবে সবাই উঠোনে তুলসী তলায় নামিয়ে এনে শুইয়েছিলো। কবরেজমশাই জবাব দিয়ে গেছলো। সেই বুড়োকে তো আবার দাওয়ার ধারে বসে থাকতে দেখা যেতো। রাস্তা দিয়ে কেউ গেলেই বলতো, "কে যায়?" বসে বসে বিড়িও খেতো!

ফ্যালা যদি অদৃশ্য হবার মন্তর জানতো একদিন সেই বাড়িটায় গিয়ে দেখে আসতো।...তারপর নিশ্চিত হয়ে ভাবতে বসতো কোন তারাটা ফ্যালার সেই 'মিথ্যে মা'! না কী সে 'তারা' হয়ে আকাশে উঠে যায়নি।

ফ্যালার মতো এমন যন্ত্রণার জীবন আর কারুর হয়েছে কখনো? যে জানতে পারছে না আকাশের ওই তারাদের মধ্যে তার 'আপনজন' কেউ আছে কিনা!

কী আশ্চর্য অদ্ভুত কথা। ফ্যালার কোনো 'আপনজন' নেই। ফ্যালার নিজস্ব একটা তারাও নেই। ফ্যালা গাছের গায়ে মুখ ঘষে।

মন্দিরের দেয়ালে মাথা ঠোকে। কোনো দেববিগ্রহের কাছে আসার সুযোগ পেলে কান্নায় বিদীর্ণ হয়ে বলে, ঠাকুর, একবার বলে দাও আমি কে? আমি কোথা থেকে এসে পড়েছিলাম ওই ঘোষালদের বাড়িতে।···কিন্তু দেববিগ্রহ তো পাথরের। উত্তর দেবার ক্ষমতা আছে তাঁর?

এখন ফ্যালা পবন ঘোষালের ধিক্কার বাক্যগুলোর মানে বোঝে। পবন বলতো, 'ভেন্ন গোঠের গরু'!···'আন ঝাড়ের তেউড় বাঁশ'··· বলতো 'জবরদখলির দাপট বেশী'।

হাঁদাভোঁদা ফ্যালা সেসবের মানে বুঝতে চেষ্টা করতো না। ভাবতো ওর মাথার ছিট আছে। ফ্যালা যদি তখন জোর করে বলতো, 'এসব কথার মানে কী?···বলতেই হবে আমায়।'···তাহলে হয়তো ফ্যালা আজ এমন শূন্যে ভাসতো না।

ফ্যালা ওদের জিগ্যেস করে করে জেনে নিয়ে ছড়াতো—কখন কোথায় কী ভাবে ফ্যালার মা ফ্যালাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো। কতটুকু ছিলো তখন ফ্যালা!···ফ্যালা সেসব জিগ্যেস করেনি।

পরম নিশ্চিন্ত ফ্যালা ভেবেছে 'খুড়ো পাগলা'।

ভেবেছে 'মা ঠাট্টা করছে'।

মুখ্যু! মুখ্যু! মুখ্যু···নিজের গালে মুখে চড়ায়।

কিন্তু খুড়ো আবার কে? ও তো ঘোষালবাড়ির ছোটকর্তা পবন ঘোষাল আর যাকে 'মা' বলছে, সে তো ওই বাড়ির বড় বৌ।···

হাটে-বাজারে চায়ের দোকানে খাবারের দোকানে অনেকেই বলে, 'কাজ করবি?'···বলে, "এইসা জোয়ান চেহারাখানা নিয়ে মেগেপেতে খেয়ে বেড়ানো কেন বাবা? খেটে খেতে পারিস না?"

অবিশ্যি সবাই যে এমন বিচ্ছিরি করে বলে তা নয়, ভালো ভাবেও বলে, "কাজটাজ করবে কিছু?"

কিন্তু দরকারি তথ্যটথ্য জেনে নিতে চাইলে যদি শোনে 'নাম নাই'···'পরিচয় নাই', দেশ. গ্রাম, জেলা, জাতগোত্র কিছুরই 'হিসাব নাই', তখন আর কথা এগোয় না।

অথচ কথাবার্তা বা চেহারাটা জেলপালানো আসামীর মতোও

নয়, চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতোও নয়। ভদ্র ঘরের মতোই।

তার মানে ঘর-পালানে ছেলে। খেটে খাবার মন নেই। যতোদিন পরের ঘাড় দিয়ে চলে।

তবে আশ্চর্য! ওই 'পর'টররা কেন কে জানে স্বেচ্ছাতেই ঘাড় পাতেও। ফ্যালা তো আর কোথাও চেয়ে খায় না। হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলেই কেউ না কেউ বলে, "তোমায় তো কোথাও খেতে-টেতে দেখি না। আমাদের সঙ্গে খেয়ে নাও না হয় এবেলাটা।"

ফ্যালা বলে, "খাবার দরকার নেই। খিদা নাই।"

ওরা বলে, "দেখে তো তা মনে হচ্ছে না বাপু। যাক যা পারো দু'গাল খেয়ে নাও।"

তখন অবশ্য দেখা যায় ফ্যালার 'পারার' ক্ষমতাটি নেহাত কম নয়।

এই ঘুরোঘুরির মধ্যেই ফ্যালা দু' তিনটে মেলা দেখলো। মেলায় ঘুরলে কেমন করে যেন খাওয়া-থাকা জুটে যায়। তবে ফ্যালা কারুর সঙ্গে তেমন ভাব জমাতে পারে না। ফ্যালার কথার ধরনটা বড় চোটপাট। এতে বন্ধু জোটে না।

কেউ যদি 'তোমায় ক'বার যেন দেখলাম। একা ঘুরছো? মা-বাপ কী কোনো গার্জেন কেউ সঙ্গে নেই?' জিগ্যেস করে উত্তর পায়, 'নেই তো নেই। তাতে তোমার কী?' তাহলে আর বন্ধুত্বর আশা কোথায়?

তবু ওর মধ্যেই দেখা গেলো কোনো মহিলার বদান্যতায় ফ্যালার পরনে একটা ডোরাকাটা পায়জামা আর একটা ডোরাকাটা হাফশার্ট।

হাটে পুরনো জামাকাপড় দিয়ে প্লাস্টিকের বালতি কিনছিলেন মহিলা। হঠাৎ কী ভেবে ফ্যালাকে ডেকে বললেন, "ও ছেলে, দেখো তো এ দুটো তোমায় গায়ে হয় কিনা। আস্তই আছে।"

ফ্যালা নিজস্ব স্টাইলে বলেছিলো, "পুরাতন জিনিস নেবো কেন? আমি কী ভিখিরি?"

মহিলা অপ্রতিভ হয়ে বলেছিলেন, "না—মানে তোমার গায়ের

জামাটা একটা ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি ! আর দেখো না—এ দুটো দিব্যি আস্ত রয়েছে, অথচ এর বদলে একটা এইটুকুন ছোট বালতিও দিতে চাইছে না। রাগ ধরে গেছে। কিনতে চাই না বলেছি।"

ফ্যালা যেন দয়া করছে এইভাবে বলে, "ঠিক আছে, দিন, তবে। মনে হচ্চে গায়ে হতে পারে।"

ফ্যালা তাকিয়ে দেখেছে ! শুধু শুধু মায়া করতে আসলো কেন ?

না, এঁকে দেখলে মোটেই মহারানীর মতো মনে হয় না। নেহাতই গাঁইয়া গেরস্থ-গিন্নী।

কিন্তু কতোদিন আর এভাবে পথের কুকুর-বেড়ালের মতো জীবন কাটাবে ফ্যালা ? মরে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আর 'মরাটা' কিছু শক্ত ব্যাপারও নয়। বিনা খরচেই মরা যায়। রাস্তায় কতো লরী, কতো ট্রাক, কতো রেল লাইন !

কিন্তু মরে যাওয়া ! সেটা ভাবতে গেলেই, ভীষণ মন কেমন করে ওঠে ফ্যালার। কার জন্যে মন কেমন ? হয়তো এই পৃথিবীটার জন্যেই !...'এই পৃথিবীটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আর কখনো দেখতে পাবোনা' ভাবলেই বুকটা কেমন মুচড়ে ওঠে।...পৃথিবীটা ছেড়ে যাওয়াই বড় কষ্ট। সে যেন হাজার-খানা হাত দিয়ে টানে, ধরে রাখতে চায় !

যার কেউ নেউ, কিছু নেই, তবু তার পৃথিবীটা থাকে। থাকে তার আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, গাছপালা, পাখিপক্ষী, চাঁদ-সূয্যি আর নক্ষত্রদের নিয়ে।...সেও তো একটা মস্ত 'থাকা'।

মরে যাওয়া মানেই তো সেই শেষ সম্বলটুকুও খোয়ানো।

সর্বস্বান্ত ফ্যালা অসহ্য হয়ে সেটুকুও খুইয়ে বসবে ?

নাঃ ! সেই শেব সম্বলটুকু খুইয়ে ফেলতে পারেনি ফ্যালা।

তাই তাকে এই পৃথিবীর মাটিতেই চরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে এই একটা ঘাটে। দেখা গেলো একদম শহর কলকাতায়। পয়সাকড়ির বালাই নেই, তবু ফ্যালা বেঁচেও আছে, এখানে সেখানে চরেও বেড়াচ্ছে, এই এক

আশ্চর্য !

ফ্যালা এখন আগের থেকে লম্বা হয়ে গেছে। মুখ-চোখ থেকে বালকের ভারটি প্রায় মুছে গেছে। নাকের নিচে গোঁফের রেখাটিই হয়তো তার কারণ! দেখা যাচ্ছে ফ্যালার পরনে সাদা পায়জামা, ডোরাকাটা শার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি, চুলে কায়দা। তার মানে ফ্যালা এখন ভালই আছে মোটামুটি।

ফ্যালা তাহলে সেই কালীমন্দিরের পানাপুকুরে ভেসে-বেড়ানো আর ঘাটের পৈঠেয় ঠেক খেতে খেতে সরে-যাওয়া পচা বেলপাতার মতো জীবন থেকে, অনেক ঘাট-আঘাটায় ঠেক খেতে খেতে ভেসে ভেসে এসে সাগরে পড়েছে ?

তা 'কলকাতা' নামের বিশাল জায়গাটা তো সাগরতুল্যই। সকল নদীর জলজঞ্জাল যেমন সাগরে এসে পড়ে দিব্যি তলিয়ে যায়, থিতিয়ে যায়, এখানেও তো তেমনি।

ফ্যালাকে কখনো দেখা গেছে হাওড়া স্টেশনের ধারেকাছে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরছে, কখনো বা বড়বাজারের ফলপটিতে দোকানীর ফাই-ফরমাশ খাটছে। কখনো ফুটপাথে উনুন জেবলে বসা চিনেবাদাম ভাজাভুজাওয়ালার সঙ্গে আলাপচারি করছে।

আবার কখনো কখনো কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে ফ্যালার একটা স্থিতু অবস্থা। দক্ষিণ কলকাতার একটা রাস্তার ধারে হকার্স কর্নারের গায়ে 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়ে' মালিকের খিদমদগারের কাজ করছে।

খদ্দের এলে উঁচু তাক থেকে কাপড়ের গাঁটরি নামাচ্ছে, খুলছে ছড়িয়ে-বিছিয়ে খদ্দেরকে দেখাচ্ছে, আবার সব গুছিয়ে বেঁধে তুলছে। খদ্দেরের সঙ্গে যা বাতচিত করবার, সেটা করেছেন স্বয়ং মালিক মনোহর বিশ্বাসই।

তবে ফ্যালার এই চাকরিটি কেবলমাত্র দোকানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ফ্যালার সীমা বিস্তৃত আরো খানিকটা।

ফ্যালা মাইনেটা পায় দোকানের কাজ করে, আর খাওয়া-পরা-থাকাটা মালিকের বাড়ির কিছু কাজ করে দেওয়ার বদলে।

দোকানে নতুন নিয়োগ করতে যাওয়া ছেলেটার কথাবার্তায়

আকৃষ্ট হয়েই আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল মনোহর বিশ্বাসের !

তবে প্রথমটা 'বাড়ির কাজ'-এর নাম করে বলেনি। বলেছিলো অন্যভাবে—

কিন্তু দোকানের চাকরিটায় লাগিয়েছিলো কীভাবে ?

সে একটা মজার গল্পতুল্য !

দোকানে কাজ-করা ছোকরাটার নিত্যি দেশে যাওয়ার জ্বালায় জেরবার মনোহর একদিন দোকান থেকে নেমে এসে ওই ভবঘুরের মতো ঘুরে-বেড়ানো ছেলেটাকে ডেকে বলেছিলো, কাজ করবে ?

'তুই' না বলায় ফ্যালা একটু স্থিতু হয়ে বলেছিলো, কী কাজ ?

এই আমার দোকানের কাজে আমাকে একটু সাহায্য-টাহায্য করা আর কী !

দোকানটা কীসের ?

মনোহর বলেছিল, ওই যে কাপড়ের দোকান। 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়'।

ঠিক আছে, করবো।

তা নিত্যি দেশে যাওয়ার বায়না করবে না তো বাপু ?

ফ্যালা অবজ্ঞাভরে বলেছে, মাথা নাই তার মাথাব্যাথা।

ওঃ, দেশ নেই ? কলকাতারই ছেলে ? ভালো ভালো, খুব ভালো ! তো এখানে—ঘরে আছে কে ?

বললুম তো মাথা নাই তার মাথাব্যথা !

ঘরও নেই ? তা বেশ ! বেশ ! তো থাকো তো কোনো এক-খানে ? সেটা কোথায় ?

ঠিক নাই। যখন যেখানে পাই।

মনোহর মনে মনে পুলকিত হয়। ঘরবাড়ি দেশভুঁই, কোনো কিছু নেই, এটাই তো আইডিয়াল ব্যাপার। 'কেউ নেই, কিছু নেই', তার মানে পিছনটানের বালাই নেই। পুলক চেপে ভারিক্কি চালে বলে, তো খাওয়া দাওয়া তো কারো কোথাও ? সেটা কোথায় ?

ফ্যালা একটু ভুরু কুঁচকে বলে, অতো জানায় আপনার দরকার ?

দরকার বাপু আমার নিজের স্বার্থেই। দোকানের কাজ বাদে

বাকি সময়টা আমার সংসারের একটু দ্যাখভাল করলে, আমার বাড়িতেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই।

দ্যাখভাল ? মানে ?

মানে আর কী এই বাজার-দোকানটা করে দিলে, রেশনটা তুললে, দরকার পড়লে কেরোসিনে লাইন দিলে। তাছাড়া—আমার গিন্নীর একটু ফুটফরমাশ খাটলে। এই আর কী! সেটা এমন কিছু না।

থাকা-খাওয়া।

নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা। একটা গেরস্থবাড়িতে। মন্দ কী ঘুরে ঘুরে আর ছন্নছাড়া হয়ে খেয়ে শুয়ে জীবনে ঘেন্না এসে গেছে।

ফ্যালা বলে, দোকানের কাজের ক্ষোতি না করে যদি হয় তো করতে পারি।

এই কথাটায় মনোহর ছেলেটার ভালোবাসায় পড়ে যায়। এই বয়েসের ছেলে, এমন বিবেচনা!...

মনোহর বলে, তাহলে আজ থেকেই লেগে যাও। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এখনি চলে এসো।

জিনিসত্তর। হ্যাত! নিয়ে আসার মতো কী ঘোড়ার ডিম আছে!

এই সত্য ভাষণে মনোহরের মন আরো হরণ করে বসে ফ্যালা। মনোহর বলে ওঠে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। অমার ওখানে দরকার মতো সবই পেয়ে যাবে। ব্যাস। খাবে-শোবে, ঘরের মতো থাকবে।

ফ্যালা ফট করে বলে ওঠে, একটা অজানা অচেনা নিষ্পর ছেলেকে ঘরের ছেলের পোস্টে বসাবার সাধ কেন ? ঘরে ছেলে নাই বুঝি ?

মনোহর ক্রমেই মোহিত, ঠিক ধরেছো তো বাপু ? ছেলের পাট নেই। শুধু একপাল মেয়ে। তো গোটাকতক পার হয়েছে। একটা এখনো জিয়ানো আছে।

ফ্যালা হঠাৎ হেসে ফেলে বলে, মেয়েদের ওপর তো খুব ভক্তি দেখছি। তো এখন থেকেই লেগে যাবো বলছেন ? কীভাবে লাগতে হবে ?

বিশেষ কিছু না। আমার সঙ্গে এখন দোকানে থাকো, পরে —আমার সঙ্গেই ফিরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে বলে রাখি বাপু, আমার গিন্নীটি একটু গড়বড়ে আছে। 'তুই-তোকারি' করে কথা বলতে পারে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব দেখাতে পারে। কিছু মনে কোরো না। মুখ অমন, তবে এমনি লোক খারাপ নয়।

ফ্যালা নিজেই তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, এই কথা! ওতে কিছু হবে না। ঝাঁটাপড়া গা! আপনিই বা 'তুমি তুমি' বলে খেটে সারা হচ্ছেন কেন? তুই বলবেন!

বেশ! বেশ! খুব ভালো। তো এতো কথা হলো এতোক্ষণ। এখনো পর্যন্ত নামটি তো জানলাম না বাপু?

নাম।

ফ্যালা স্থিরস্বরে বলে, দেবীচরণ আজানা!

হ্যাঁ, এতোদিনে ফ্যালা নিজেই নিজের একটা নামকরণ করে নিয়েছে। ইস্কুলের খাতায় নাম তো ছিল একটা। ষষ্ঠিচরণ।

তো ষষ্ঠিঠাকুর তো দেবীই। তাহলে দেবীচরণ হতে দোষ কী? আর ওই পদবী? সেটাকেই বা 'অজানা' বলতে ভুল কোথায়?

মনোহর একটু থমকে বলে, দেবীচরণ? এ তো খুব ভালো নাম, কিন্তু 'অজানা'? অজানা আবার কী রকম পদবী?

ফ্যালার নিজস্ব প্রকৃতি উন্মোচিত হতে থাকে। অতএব বলে ওঠে, কেন অবাক হবার কী হলো? 'জানা' পদবী হয় না? অজানা হতেই বা দোষ কী?

হয় সেটা ফ্যালার জানা। কারণ 'দ্বারুকেশ্বর স্মৃতি বিদ্যালয়'-এ আর একজন মাস্টারমশাই ছিলেন 'সত্যগোপাল জানা'!

মনোহর একটু থতমত খেয়ে বলে, না না, দোষের কিছু নেই। তবে শুনিনি তো কখনো!

হাজার লক্ষ নাম থাকে, হাজার লক্ষ পদবী। সবই কী আর সবাই শুনে বসে থাকে?

ফ্যালা ইদানীং বুঝতে পারছিলো এ পৃথিবীতে চরে বেড়াতে হলে মানুষের একটা নাম থাকা বিশেষ দরকার। 'কিছু না' চিরকাল চালানো যায় না, তাই ফ্যালার এই কৌশল।

মনোহর ফ্যালাকে সঙ্গে করে বাড়িতে ঢুকে এসেই ডাক দিয়েছিলো, এই যে—টুকুর মা, এই ছেলেটিকে নিয়ে এলাম! আমার দোকানে আমার সঙ্গে কাজ করবে, আর বাকি সময়টা তোমার যা যতোটি পারবে করবে! কেবলই তো বলো বাড়িতে একটা ছেলে লোক থাকা দরকার। তা তুমি ততোক্ষণ এর সঙ্গে কথাটথা বলো, আমি চানটা সেরে আসি! টুকু কোথায়?

বাঃ! আজ থেকে ওর ইস্কুল খুলে গেছে না?

ফ্যালার বুকটা হঠাৎ ছাঁত করে ওঠে। 'ইস্কুল'। কতোদিন যেন ফ্যালা এই শব্দটার ধারেকাছেও আসেনি। এ বাড়িতে একটা মেয়ে আছে, যে ইস্কুলে পড়ে। ভালো লাগা আর না লাগার মতো একটা অবস্থা আছন্ন করে ফেলে ফ্যালাকে।

তবে সেই আচ্ছন্নতার ওপর একটা ঢিল এসে পড়ে তক্ষুণি!

বিশ্বাস কর্তা যে আশ্বাসই দিক, বিশ্বাস গিন্নী কিন্তু কর্তা চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করে বসেন, চেহারাখানা তো মন্দ না, ভদ্রঘরের মতোই। পরন-পরিচ্ছেদের এমন বিচ্ছিরি ছিরি কেন?

ফ্যালার তাৎক্ষণিক জবাব, তো বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ানো জীব, ধোপ পোশাক পরে বেড়াবে বুঝি?

ও বাবা কথা তো দেখছি বেশ চোটপাট। তো রান্না করতে জানিস?

মনোহরের চিন্তায় 'রান্নার' ব্যাপার ছিলো না। মনোহর গিন্নীর চিন্তায় ওটিই প্রথম এলো।

ফ্যালা অবশ্য নেতিবাচক মাথা নাড়লো।

জানিস না তা মুখ দেখেই বুঝেছি। শিখিয়ে দিলে পারবি না?

দোকানের কাজের সময় বাদ, যদি রান্নার ইস্কুল খুলে বসেন তো পারতেও পারি।

ওমা, কথা শোনো ছেলের। তো বলি এতদিন কী কাজ করতিস?

কিছুই না।

ও মা! তোকে অমনি বসিয়ে খাইয়েছে এতোকাল?

সে কথায় কাজ কী?

ও বাবা, এ যে খই ফুটছে। তো রান্না না পারিস কিছু তো করবি? মশলা পিষতে পারিস?

মশলা? কী মশলা? কীসে পিষতে হবে?

ওমা। কী মশলা আবার? হলুদ লংকা জিরে সর্ষে—শিল-নোড়ায় পিষতে হয় জানিস না? আকাশ থেকে পড়লি না কী?

ওঃ, বাটনাবাটার কথা বলছেন?

তাই তো বলছি। পারিস সেটা?

ও তো মেয়েছেলের কাজ!

কী বললি? অ্যাঁ। বাটনাবাটা মেয়েছেলের কাজ?

তাই তো দেখেছি চিরকাল। ছেলে লোক বাটনা বাটতে বসছে। হি হি হি।

তা হলে তো বলবি 'ছেলেলোককে' ঘর ঝাড়ামোছা করতে দেখিসনি কখনো! করবিটা কী তবে?

সেটা পেরে যাবো মনে হয়।

তবু ভালো!

তো ভালো করে তেল মেখে চানটান করবি তো? হাতে-পায়ে খড়ি উঠছে। কই সঙ্গের কাপড়-গামছা কই?

এই মহামুহূর্তে মনোহরের স্নানান্তে আবির্ভাব! তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "সে সব নিয়ে আসতে পারেনি। আমি খুব তাড়া দিয়েছিলাম তো। তো আমি বুদ্ধি করে দোকান থেকে একখানা ধুতি আর ফুটপাথ থেকে একখানা গামছা নিয়েই এসেছি।"

বিশ্বাস-গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তবে তো খুব বুদ্ধির কাজ করেছো! বলি সদ্য চান করে উঠেই নতুন কাপড় পরবে?

কেন? পরতে নেই?

এতোখানি বয়েস হলো এও জানো না ছাই। চিরটাকাল আকাশমুখো হয়ে চলা।...চান করে ওঠে নতুন কাপড় পরলে, বাপ-মায়ের অমঙ্গল ঘটে না?

এই কথা?

মনোহর হেসে ওঠে, সেই যে বলে না, 'মূলে মা রাঁধে না—তা

তপ্ত আর পান্তো’ ! এ হলো তাই। মা-বাপই নেই। ভাইবোন আত্মজন কেউই নেই।

ওঃ, তাই। তাই এমন চোটপাট কথা ! বদবিচ্ছিরি বন্ধুদের সঙ্গে ওঠাবসা !

ফ্যালা অবলীলায় বলে ওঠে, আপনি কোন বিচ্ছিরিদের সঙ্গে মিশেছিলেন, অ্যাঁ ? আপনারও তো কথা বেশ সপাট।

হ্যাঁ, বলেছিলো ফ্যালা একথা।

তবু ফ্যালা রয়েও গেছে। তার কারণ ফ্যালার সরল নিষ্কপট স্বভাব। ফ্যালা লোভী নয়, ফাঁকিবাজ নয়। চোটপাট করে, তবে তার মধ্যে অসভ্য ঔদ্ধত্য নেই। যেটা আছে, সেটা হচ্ছে ‘অবোধের’ ঔদ্ধত্য !

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার ফ্যালাকে নিয়ে দোকান খুলতে চলে গিয়েছিলো মনোহর বিশ্বাস। ফিরলো রাত আটটায়, দোকানে ডবল তালা-টালা মেরে।

এই ফেরার পর ফ্যালার ভাগ্যে ‘টুকু’-দর্শন।

টুকুও মায়ের মতোই বাক্যবাগীশ। ফ্যালাকে দেখেই বলে উঠলো, এ মা। এটি আবার কে ?

মা সংক্ষেপে বললো, তোদের বাবার দোকানের কর্মচারী।

কর্মচারী। হি হি হি। ‘কর্মচারী’ শুনলেই তো মনে হয়, হয় টেকো-শুঁটকো হাফবুড়ো, নয়তো ঝোলাগোঁফ ফোলা গাল। এ আবার কী রকম কর্মচারী ? কী কর্ম করবে ? দোকানঘর ঝাঁট দেওয়া ?

মা বললো, এই হলো শুরু মেয়ের কথার কারবার ! থাম। এই যে দেবীচরণ, এখন তো রাত হয়ে এসেছে এখন কী আর টিফিন খাবে ? না একেবারে একটু পরে ভাত খেতেই বসবে ?

টুকু বলে ওঠে, বাঃ মা, বেশ। ভালোমানুষ পেয়ে আজকের অমন ভালো টিফিন আলুর পরোটা দুখানা বাঁচাবার তাল।

মা রেগে বলে, বাইরের লোকের সামনে মাকে অমন হ্যানস্থা করে কথাবলবি না টুকু।

টুকু চোখ কপালে তুলে মললো, ‘বাইরের লোক’ আবার কী গো

মা ? একেবারে অন্দরের অন্তরলোকে এনে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে দেখছি ।…অন্দরে ঢুকিয়ে নেওয়া লোকেদের সামনে যদি মেপেজুপে কথা বলতে হয় তাহলে তো বোবা বনে যেতে হবে। তো হ্যানস্থা আবার কখন করলাম ?

ওই যে আমি কিপটেমি করে ওর টিফিনটা বাঁচাচ্ছি ?

হঠাৎ ফ্যালা বলে ওঠে, আমাকে নিয়ে যদি এমন ঝগড়াঝাঁটি হয় তাহলে কিন্তু আমি কেটে পড়বো। 'কোঁদল কাজিয়া' আমার দু'চক্ষের বালাই।

টুকু হঠাৎ হি হি করে হেসে বলে, 'কোঁদল' মানে তো জানি, 'কাজিয়া' মানে ?

ওই একই।

আরে ও নিয়ে তুই কিছু ভাবিস না। ঝগড়া নয়, মায়ের সঙ্গে আমি ওইরকম ভাবেই কথা বলি। ওটা মজা !

তো আপনার মা তো মজা পাচ্ছে না, রেগে যাচ্ছে।

রেগে যাওয়াও আবার মায়ের মজা।

ফ্যালা হেসে উঠে বলে, আপনাদের মজার ধারাটি তো বেশ।

ফ্যালার হাসিটি বড় সুন্দর। কারণ ফ্যালার দাঁতগুলি যেন সাজানো মুক্তোপাটি। ফ্যালা যে একদা চাঁদের টুকরোর মতো ছিলো, সেটা ফ্যালার দাঁত আর হাসি দেখে কিছুটা মালুম হয়।

ফ্যালা বলে, এখন খিদার সময় ওসব আলুমালু রাখেন তো। খেলে খিদা নষ্ট করা। ভাতের কাচে আর কিচু আচে ?

টুকু আড়ালে মাকে বলে, বাবা ওকে পেলো কোথায় ?

রাস্তায় কুড়িয়ে।

তা ফ্যালার ভাগ্যই তো তাকে কুড়িয়ে পাওয়া।

ফ্যালা বলে, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ?

টুকু মায়ের মতোই রেগে উঠে বলে, অ্যাঁ, তুই আমায় 'আপনি' না করে 'তুমি' করলি যে ?

আর নিজে যে 'তুইমুই' করচো ? বয়েসে কে বড়ো কে ছোটো ?

ওঃ, বয়েস নিয়েই বুঝি সব হিসেব ? মান্যেই ছোট বড় ।

ফ্যালা একবার টুকুর দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকায় । ফ্যালার খুব অপমান বোধ হয় । অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ওঃ, আপনি মনিব, আমি 'চাকর', তাই মানায় উঁচু-নীচু, এই তো ? ঠিক আচে, মনে থাকবে ।

টুকু আবার আগের মতো হি হি করে হেসে উঠে বলে, এ মা ! তুই কেঁদে ফেললি না কী ? ঠাট্টা বুঝিস না ?

কাঁদতে আমার দায় পড়েছে ।

তবে হাস ।···আর ইচ্ছে করলে তুইও আমায় 'ছোড়দি, তুই' বলতে পারিস । আমি তো আমার দিদি তিনটেকে তুই-ই বলি । বড়দি মেজদি সেজদি তিনটে দিদি আছে আমার, বুঝলি ?

জানি ।

ওমা, আজই তো এসেছিস । কি করে জানলি ?

ফ্যালা আবার ফিক করে হেসে ফেলে বলে, কর্তাবাবু বলেচে, তেনার শুধু একপাল মেয়ে, ছেলে নাই ।

ও—হি হি, তাই বুঝি তোকে 'ছেলে'র পোস্ট দিতে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে ? তো তুই যে আমায় জিজ্ঞেস করলি, কোন ক্লাশে পড়ি, তুই পড়ালেখার কী জানিস ?

ফ্যালা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, জানি না কিচু । লোকমুকে শোনা ।

আরেব্বাস । তাতেই সর্দারির শখ ? তো কোন ক্লাশে পড়ি বললে তুই বুঝতে পারবি ?

ফ্যালা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, না ।

টুকু একটু তাকিয়ে দেখে বলে, উঁহু । মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারিস ।

ওঃ । অমনি মনে হচ্চে ! মুক দেখে পেটের কথা বুজতে পারেন আপনি ?

পারিই তো ।

তা হলে হাত দেকে কপালের কতাও বুঝতে পারেন ?

এ মা । আমি কী জ্যোতিষী না কী ? তোর বুঝি কপালটা

জানতে ইচ্ছে করে ?

ফ্যালা একটু অন্যমনাভাবে বলে, পুরো জীবনখানাই জানতে ইচ্ছা করে।

বিশ্বাস-দম্পতির রাত্রিকালের নিভৃত আলাপের মধ্যেও প্রায়ই 'ফ্যালা' বা 'দেবীচরণ' প্রসঙ্গ এসে পড়ে।…"মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে !…হয়তো মান-অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এয়েচে।"

বোধহয় মা-বাপ মরা। বেদরদী মামা খুড়োর কাছে মানুষ হয়েছে। আর তাদের দুর্ব্যবহারেই—এমন তো হয়ই।

কিছুতেই কিন্তু কী জাত-গোত্তর ফাঁস করতে চায় না। শুধোলেই বলে, "সাফ কথা তো বলেই দিয়েচি সব আগে। কেউ নেই আমার ওসব কিচু জানাও নাই।"

কিন্তু লেখাপড়া কিছু জানে মনে হয়। টুকু বলে, ওর ইস্কুলের বইগুলো সব পড়তে পারে। টুকুকে না কী অংকও বুঝিয়ে দিয়েছিলো একদিন।

টুকু ওকে বড় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।…মনোহরের আক্ষেপের পলা !

এখন টুকুর মার ললিতকণ্ঠের চাপা হাসি শোনা যায়. ওসব ঢং। ভেতরে ভেতরে খুব টান। ওর সঙ্গে দেবীচরণের খাওয়া-দাওয়ার একটু উনিশ-বিশ দেখলেই রেগে আগুন হয়। আমার 'কিপটে নীচু নজর' বলে পাঁচ কথা শোনায়।

তা আবার বেশী মেলামেশা করে না তো ? মানে বয়েসটা তো খারাপ।

বেশী মেলামেশা ? কেন আমি কী চোখ বুজে বসে থাকি না কানা অন্ধ ? হুঁ। আমার রাবণ রাজার মতো কুড়ি চক্ষু বুঝলে !

সেটা চিরকালই বুঝে আসছি। তবে আসল চক্ষু দুটিরই অভাব।

বটে। সেই আসল দুটি কী শুনি ?

বোধ আর বুদ্ধি।…কী হলো ? রেগে মাটিতে শুতে নামছো যে ?…তাহলে আর কী ভুল বলেছি ? তামাশা বোঝো না ? বাপও মেয়ের পদ্ধতিই ধরে। বলে…তবে ছেলেটা সত্যিই ভালো। সেদিন

দোকানে মুখ ফস্কে বলে ফেলেছি, আগের ছেলেটার একটু 'হাতটান' ছিলো। তো অবাক হয়ে বলে, 'হাতটান' মানে? হাত টানাটানি করে? হা হা হা।

আমার এখানে আসার পর থেকে শরীরে কেমন চেকনাই দেখা দিয়েছে দেখেছো? 'বাড়ের' বয়েস তো!

কতো বয়েস?

বলতে চায় না। জানেও না হয়তো। জিগ্যেস করলে বলে, 'কে তার হিসেব রেখেছে। জন্মকালে তো ঘড়ি হাতে বেঁধে জন্মাই নাই। তবে মনে হয় তেরো-চোদ্দ।

কথাবার্তা ভারী মজার। শুনতে চোটপাট, তবে আবার মিষ্টিও লাগে। কিন্তু চালাক খুব। এতোদিনের মধ্যে শত কৌশলেও পেটের কথা আদায় করতে পেরে উঠলুম না। পরিচয়ও জানা গেলো না। বললেই বলে, "জানা নাই।...আমারে কেউ বলে নাই।"

তা হ্যাঁগো। এটা একরকম ব্যাধি নয় তো?

ব্যাধি মানে? এমন স্বাস্থ্য ভালো ছেলে।

না না, সে ব্যাধি নয়। বলছি অনেক সিনেমার গল্পয় যেরকম দেখা যায়—'স্মৃতিভ্রংশ ব্যাধি'। দেখি তো গল্পের হিরো কি হিরোইন তার পুরনো কথা সব ভুলে গেছে। বাড়িঘর মা-বাপ বংশপরিচয়।

তাই যদি হবে, তো—লেখাপড়াটা মনে আছে কী করে? দোকানে দুপুরের সময় খুব তো গপ্পোর বই পড়ে দেখি।

সেও একটা কথা বটে।

তা এই একটা কথা বটে।

দেবীচরণ টুকুর ঘর-টেবিল ঝাড়বার সময় কেবলই টুকুর বইটইগুলো নিয়ে উল্টোয়-পাল্টায়, পড়ে। তাছাড়া গল্পের বই পেলে তো প্রায় হামলে পড়ে গোগ্রাসে পড়ে নেয়। মাঝে মাঝে দোকানে নিয়েও যায়। সিনেমার স্মৃতিভ্রষ্টের নায়ক-নায়িকারা এ ব্যাপারে কী রকম আচরণ করে তা জানা নেই টুকুর মার।

মনোহরের দোকানের আজকাল একটা নতুন ব্যবস্থা হয়েছে—

দেবীচরণ সকালবেলা সাড়ে নটা নাগাদ দোকান খুলতে যায়, মনোহর একটু পরে ধীরেসুস্থে যায়। তখন দেবীচরণ বা দেবু বাড়ি চলে এসে নাওয়া-খাওয়া সেরে নিয়ে ফের গিয়ে হাজির হয় দোকানে। মনোহর বাড়ি ফিরে মৌজ করে স্নান আহার করে একটু দিবানিদ্রাও সেরে ফের দোকানে গিয়ে বসে সেই দুপুর গড়িয়ে বিকেলে। এই এক সুস্থির ছন্দে চলছে এখন মনোহরের জীবনটি। কেমন যেন একটি আনন্দের ছন্দেও।

দোকান থেকে বাড়ি বেশী দূরে নয়, তবে এই সময়টা মনোহর একটু আরামের আশায় এতটা রিকশা চেপে যায়। আর তার রিকশায় চেপে—দেবীরচরণের বিকেলের টিফিনটাও যায়। সকালে যেটা খুব যত্ন করে মেয়ের জন্যে বানায় টুকুর মা, তার থেকেই রেখে দেয় অর্ধাংশ।···প্রথম দিকে অবশ্য বিশ্বাস-গিন্নী স্বাভাবিক নিয়মে কাজের লোকের টিফিন হিসেবে রুটি-তরকারি চালাতে চেষ্টা করেছিলো, মেয়ের শ্যেনদৃষ্টি আর তীক্ষ্ন বাক্যবাণের ফলে, সে চেষ্টা সফল হয়নি।

তো এই দুপুরটায় তো খদ্দেরের ভিড় কম। বলতে গেলে দোকান আগলাতেই গিয়ে বসা। অতএব গল্পের বই পড়ার সুবর্ণ সুযোগ। এ অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো ফ্যালার নিমাইদাদের পাঠাগার-এর খিদমদগারি করতে। নিমাইদা ডেকে ডেকে বই পড়তে দিতো বেছেবুছে।

অনুপস্থিত টুকুর টেবিল থেকে বই হাতিয়ে নিয়ে যাওয়া কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। টুকু তো আর ইস্কুলের সময় ও বই পড়ছে না। তবে বিবেকের দায়ে নিয়ে যাবার সময় বিশ্বাস-গিন্নীকে বলে যায়, মাসিমা, ছোড়দির এই বইটা দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। খুঁজলে বলবেন।

ওর তো একশোখানা বই, ওই একটা কী আর খুঁজতে বসবে?

'গল্পের বই রহস্যে' উদাসীন টুকুর মা ওই কথাই বলে। টুকুর মা সিনেমা বলতে পাগল, টি. ভি. দেখতে বসলে অজ্ঞান, তবে ছাপার অক্ষরের সঙ্গে তেমন প্রেম নেই। বই পড়ায় তার বড় আলিস্যি।

তাই সে বলে, 'একশোখানা' বই, ওই একখানাই কী আর খুঁজতে বসবে?

অথচ তেমন ঘটনাই ঘটে।

টুকু শুনে বাড়ি মাথায় করে। এবং 'দেবু' ফিরলেই তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, এই দেবু, তুমি ওই নতুন গোয়েন্দা গল্পের বইটা হাপিস করলে মানে? আর কেউ পড়বে না?

কী জানি কেন আজকাল আর টুকু 'তুই-টুই' করে না। 'তুমি' বলে।

সেই বলাটা কী, টুকুকে দেবু 'আপনিই' চালিয়ে চলেছে বলে?

না কী দেবু এখন মাথায় আরো খানিক লম্বা হয়ে উঠেছে বলে? তার গোঁফের রেখাটা আর একটু ঘনত্ব পেয়েছে বলে? আর সবসময় ভব্যিযুক্ত পোশাক পরে থাকে বলে?

তা ভালো ভালো জামা পোশাকই তাকে সাপ্লাই করে মনোহর। বলে, তুই তো বাবা 'মাস-মাইনে' বলে টাকাটা নিতেই চাষ না। তো শখসাধটার ব্যবস্থা আমিই করে দিই।...দোকানেরও জেল্লা তোর মতো একটা সেলসম্যান ছেলে থাকা। হ্যাঁ, এখন ফ্যালার ওপর ওই নতুন নামটা বর্তেছে। মনোহরের, 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়ের' বাড়বাড়ন্ত ঘটায় ফ্যালার 'পোস্ট' এখন 'সেলসম্যানের'।

মনোহরের বিবেচনায় ছেলেটা পয়মন্ত!

তো মাইনে নিতে চায় না এই যা অদ্ভুত।

প্রথম প্রস্তাবলাতেই বলেছে, "মাইনা নেওয়ার আমার কি দরকার? সবই তো পেয়ে যাচ্ছি। রামরাজত্বি করে চারবেলা খাওয়া, আরামের বিছানায় শোওয়া, মাথায় মাখতে তেল, গায়ে মাখতে সাবান, ছাতা, জুতো, জামা-কাপড়, সেলুন, লণ্ড্রী, কোনটার অভাব আছে? তাহলে টাকা নিয়ে কী আমি ধুয়ে জল খাবো?

এমন কথা শুধু এই বিশ্বাস-দম্পতি কে ভূ-ভারতে কে কবে শুনেছে?

ওরা হাঁ হয়ে বলেছে, তা হ্যাঁরে, এসব তো সংসারে যে যখন থাকে, পায়ই। তা বলে কেউ মাইনে ছাড়ে? বরং উত্তরোত্তর বাড়াবার তালে চাপ দেয়।

সে যার যেমন বুদ্ধি। তা টাকাগুলো নিয়ে করেটা কী?

কী আবার করে? দেশে পাঠায়, জমায়, বিড়ি-সিগারেটে ওড়ায়—

ফ্যালা ওরফে দেবীচরণ বলে ওঠে, তা যার যা ব্যবস্থা। যার দেশও নাই, বিড়ি-সিগরেটও নাই, জমানোরও দায় নাই, তার আর কী দরকার?

বিশ্বাস গিন্নী গালে হাত দিয়ে বলে, হ্যাঁরে, জমানোর আবার দায় কী? ভবিষ্যতের জন্যে জমানোর দরকার নেই।

ভবিষ্যৎ। হ্যাত। যার ভূত নাই, তার আবার ভবিষ্যৎ! খাচ্ছি শুচ্ছি যা করবার করচি, ব্যস, দিব্যি দিন চলে যাচ্ছে। এই হলেই হলো!

তা এক হিসেবে হয়তো ফ্যালার বর্তমান জীবনদর্শনটি এই-ই।

দিন তো সত্যিই দিব্যি চলে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই যেমন একটা ভালোলাগা ভালোলাগা ভাব আসে।···কেন হঠাৎ এমন আসে? ভেবে ভেবে বুঝেছে এই ভালোলাগাটা যেন ওই 'টুকু' নামের মেয়েটা।

মনে মনে তো আর ওকে 'ছোড়দি' বলে না ফ্যালা, অর্থাৎ দেবু! 'টুকু'ই বলে।

ভারী মজার মেয়ে। ওর গল্পের বইটা টেনে নিয়ে গেলে, কী তম্বিগম্বি।···"যেটাই আমি পড়তে যাবো, সেটাই বাবুর দরকার। বাড়িতে আর বই নেই? যাও না বাবার ঘরে, ওই যে রামায়ণ মহাভারত না কী সব আছে, তাই পড়োগে না।

ফ্যালা অপমানাহত হয়ে বলে, ঠিক আছে, তাই পড়বো এবার থেকে। তা পড়ার দরকারটাই বা কী? মুখ্যু মানুষ, দোকানের চাকর বৈ তো না।

ব্যস, তখন আবার কী খোশামোদ! কী খোশামোদ।

কেবলই বলে, "ঠাট্টা বোঝো না কেন? রামবোকা একখানা!" সে-ই বই হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছাড়বে। ছুতোয়-নাতায় ফ্যালার সঙ্গে কথা বলতে আসে। অথচ ভাব দেখায় যেন হ্যানস্থা করতেই বলছে এসব। ছলনাটা ধরতে পারে ফ্যালা।

মাসিমা-মেসোমশাই দুজনাই কতো ভালোবাসে। সবই তো এখন ভালোই বলা চলে। শুধু ফ্যালা যদি একবার জানতে পারতো ফ্যালা কে?

এই না-জানার যন্ত্রণাটা কী মুছে ফেলা যায় না? চেষ্টা করেছে, পারেনি। পায়ের তলায় মাটি না থাকলে কী দাঁড়ানো যায়?

দোকানে এখন বেশ রমরমা।

মহিলাদের ভিড়ই বেশী। পুজো আসছে, তাই আরো বেশী।

সাজাগোজা ভালো ভালো মহিলা।

'সেলসম্যান' দেবীচরণ হঠাৎ হঠাৎ কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে!

এই বিহ্বলতার একটা কদর্থ করাও অসম্ভব ছিলো না।

মন্তব্য করা চলতো, "দোকানের ছেলেটা কী অসভ্য! কীরকম হাঁ করে তাকিয়ে আছে দ্যাখো।"...কিন্তু সেটা বলা চলে না। দোকানের ছেলেটা তরুণীদের দিকে দৃকপাত মাত্রও করে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শুধু মধ্যবয়সিনীদের দেখলে। যেন ওদের মধ্যে কী খোঁজে।

এটা একটা রহস্য।

দেবুর ভাবান্তর মনোহরের দৃষ্টি এড়ায় না। তবে কদর্থ-সদর্থ কোনো অর্থই খুঁজে পায় না মনোহর। 'গিন্নী গিন্নী' মেয়েরা শাড়ি নিয়ে দরদস্তুর করছে। দেবু কেবলই তাদের কথার ঠিকমতো উত্তর না দিয়ে ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে। কে বলবে এই ছেলেরই কথায় খৈ ফোটে। চটাপট জবাব যোগায়।

অথচ কিছুদিন থেকে ওই অদ্ভুত ছেলেটাকে ঘিরে বিশ্বাস-দম্পতি তাদের মনের নিভৃতে যেন একটি স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছে। তিন তিনটি জামাই-ই তো দারুণ বিজি। বড় জামাইয়ের বাপের পলিথিন শীট্-এর কারবার, অনেক টাকার মালিক, বাপের একমাত্র ছেলে। বাপের ব্যবসাপত্র ছেলেকেই দেখতে হয়। সে যে কস্মিন কালের শ্বশুরের এই 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়-এর ভার নিতে আসবে

এমন আশা করা দুরাশা। মেজ জামাইয়ের রেল কোম্পানির চাকরি, তার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আর সেজর দেশে বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে জমিজমা বাগান পুকুর গোয়াল খামার, মস্ত একান্নবর্তী পরিবার। সেই মেয়ে-জামাই দু'বছরে একবার আসতে পেরে ওঠে না।

দেখেশুনে ভালো পাত্রেই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে বটে মনোহর। তাদের আখেরটাই দেখেছে। নিজেদের আখেরের কথা চিন্তা করেনি তখন। এখন করছে। দোকানটা রাখবে কে? শেষ বয়সে বুড়োবুড়িকে দেখবে কে?

শেষ ভরসা এই ছোট মেয়েটা।

মনের মধ্যে থিতিয়ে থাকা সংকল্প, 'টুকু'র বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরে রাখতে হবে।

অবিশ্যি দামী পাত্র খুঁজলেই, দেখা যাবে সে ছেলে 'ঘরজামাই' থাকতে রাজী হয় না। অথচ মনোহরের সেটাই দরকার। টুকুটাকেও যে আবার অন্য মেয়েদের মতো একখানা জব্বর শ্বশুরবাড়িতে চালান করে দেবে, এ ইচ্ছে করে না। মেয়েটা যেন কেমন একটু ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপাও। মা-বাপের কাছে থাকতে পেলে সাতখুন মাপ, আর কেউ তেমন দয়া করবে?

দেবীচরণ যখন প্রথম এসেছিলো, তখন অবশ্য ওদের মধ্যে এমন অদ্ভুত চিন্তার বাষ্পও মনে আসেনি। একটা 'কুড়িয়ে পাওয়া' 'কাজের ছেলে'কে ঘিরে এমন স্বপ্ন দেখতে বসার কথাও নয়।···কিন্ত ছেলেটা যেন দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ছে। ক্রমশই দেখা যাচ্ছে ছেলেটা রূপবান। শুধু রূপবানই নয়, 'স্বাস্থ্যবান'ও। এবং সৎ সভ্য ভদ্র মার্জিত। তাছাড়া কর্মনিষ্ঠা। এমন কর্মনিষ্ঠা কটা ছেলের মধ্যে পাওয়া যায়?

ঠিক এইরকম একখানিই তো স্বপ্নলোকে ছিলো। ভগবানই হাতে করে এনে দিয়ে গেছেন না কী? তবে কাজে লাগাবার সময় যখন টুকুর মা বলেছিলো, তো হ্যাঁগো—জানাচেনা নেই, বাড়ির মধ্যে ঢোকাবে?

মনোহর বলেছিলো, ঢোকালেই জানাচেনা হয়ে যাবে।

দেশভুঁই নেই, তিন কুলে কেউ নেই—

আরে বাবা, সেটাই তো সুখের। দেশভুঁই থাকলেই তো নিত্যি দেশে যাওয়ার জরুরি দরকার পড়বে।...আজ মা মরবে, কাল বাপ মরবে, পরশু ভাইবোনের মরমর অসুখ হবে। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, সেটাই মঙ্গল। যে কেউ থাকলেই মুরুব্বিয়ানা করতে আসবে।

কিন্তু এখন মনোহর বিশ্বাস আর বিশ্বাস-গিন্নী তরুবালা বিশ্বাস ভেবে দেখছে, ছেলেটার ওপর 'মুরুব্বিয়ানা' করতে আসার মতো একটা আত্মীয়জন থাকলেই যেন ভালো হতো। এমন তো হয়, হতে দেখা যায়, কিপটে-কঞ্জুস লোকটোকেরা ঘাড়ে-পড়া ভাইপো-ভাগ্নেটাগ্নেকে দুরছাই করে তাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকে, কিন্তু ছেলেটা যদি কোনোমতে দাঁড়িয়ে পড়ে তখন তার বিয়েটিয়ের দিব্যি মুরুব্বি হতে এগিয়ে আসে সেই লোক। দেনাপাওনা নিয়ে দরাদরি করে কন্যাপক্ষর সঙ্গে, ভাব দেখায় ছেলেটার কতোই হিতৈষী।

তা দেবীচরণের তেমন কেউ একটা গজিয়ে উঠলেও মনোহর বোধহয় কিছুটা শান্তি পেতো। তবু তো একটা শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যেত।

কিন্তু ছেলেটার কী বিয়ের বয়েস হয়েছে?

মনোহরের কাছে কতোদিন রয়েছে?

বড়জোর বছর চার-পাঁচ। তবু? এসেছিলো যখন তখন কতো বয়েস ছিলো?

কিন্তু এসেছিলো যখন, তখনকার সঙ্গে চেহারায় যে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে।

তখন কী ছেলেটা এতোখানি লম্বা ছিলো? এমন ছিপছিপে? এতোটি ফর্সা? মুখে এমন একখানি পুরুষজনোচিত ছাপ ছিলো। সর্বাঙ্গে এমন সাজামাজা সতেজ ভাব? ...চুলের ছিলো এমন সৌকুমার্য...ছিলো না। যেটা ছিলো, সেটা যেন একটা রুক্ষ তেজ মতো।

এখন? এখন সবটা মিলিয়ে দেখলেই মনে এসে যায়, "জামাই

করবার মতো।”

মনোহরের একটা জামাইও কী এমন ‘সুকান্তি’ ‘সুদর্শন’? এর মধ্যে যেন এখন ক্রমশই ফুটে উঠছে ‘বড়ঘরের ছেলের’ মতো লাবণ্য। এখন সেই ‘কাজ-করা ছেলে’ ভাবের স্মৃতিটি পুরো মিলিয়ে গেছে।

এখন যেন বাড়ির একটি সমীহের অতিথি।

এইজন্যে অতিথি মনে হয়, ‘মাইনে’ শব্দটার সঙ্গে ওকে জোড়া যায়নি বলে। আজও দেবীচরণ অনায়াসে বলে, আলাদা করে টাকা নেবার কোনো মানে তো দেখি না। যা দরকার যা ইচ্ছের সবই তো পেয়ে যাই। ‘হাতখরচের’ কথাই বা ওঠে কী জন্যে? আপনার কতো টাকাই তো এই হাত দিয়ে খরচ হচ্ছে।

এই আভিজাত্যের ভঙ্গীটিই বিশ্বাস-দম্পতিকে এতো আকর্ষিত করছে। ও পরিচয় বলুক না বলুক, নিশ্চয়ই ‘ভালো ঘরের’ ছেলে।

তা একা আশীর সামনে দাঁড়িয়ে ‘দেবীচরণ’ও তাই ভাবে বটে।...

ভাবে আমি কী তাহলে সত্যিই কোনো বড়ঘরের ছেলে? যার সত্যিকার মা ‘মহারানীর’ মতো।...তা নইলে ভালো খেয়ে পরে আর নিয়মে থেকে থেকে চেহারাখানা এমন ‘বড়ঘর মার্কা, বড়ঘর মার্কা’ জৌলুসদার হয়ে উঠছে কেন?

ভাবতে গেলেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। মনে পড়ে সেই এক ভয়ংকর মুহূর্তের অমোঘ ঘোষণা, “তোর সত্যিকার মা— মহারানীর মতো মা—”

কেন? কেন? কেন তুমি ‘যাত্রাকালে’ হতভাগা ফ্যালাকে এই কথাটি শুনিয়ে দিয়ে গেল? যদি না শোনাতে কী এসে যেতো পৃথিবীর?

এই কথাটাই মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে ফ্যালার। সেই সুষমা ঘোষালের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় এই পরম সত্য খবরটি ফ্যালাকে না জানিয়ে গেলে পৃথিবীর কী ক্ষতি হতো?

ফ্যালা এমন সর্বহারা হয়ে গিয়ে পৃথিবীতে এমন একটা ফালতু হয়ে বেড়াতো না!

নিজেকে 'দেখলেই' যেন নতুন করে মনের মধ্যেকার সেই গভীর ক্ষতের বেদনাটা জেগে ওঠে ফ্যালার।

তবু দেখে।

সুযোগ পেলেই আরশির দিকে তাকিয়ে চেয়ে থাকে নির্নিমেষে। ..."আমার মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সে রক্ত কার? কাদের বংশের? আমার মুখের ছাঁচ কার মতো? আমি যদি তাকে কোথাও কোনোখানে দেখতেও পাই, চিনতে পারবো? কেউ সাক্ষী দিয়ে চিনিয়ে না দিলে?"

অসম্ভব।

তা পারা যায় না।

অস্ফুট চৈতন্যে শিশুকে কেউ যদি সামনে ধরে চিনিয়ে না দেয়, "এই আমি তোর বাবা, এই আমি তোর মা," বোঝে সাধ্য কার?

তবু যেন সেই অসাধ্য কাজটাই বরাবর চেষ্টা করে চলে ছেলেটা। সুন্দরী কোনো মধ্যবয়সিনী মহিলাকে দেখলেই, হাঁ করে দেখে। আজকাল সুন্দর কোনো সম্ভাব্য বয়সের পুরুষকে দেখলেও থমকায়।

ফ্যালা কী এঁদের সঙ্গে আলাপ করবে? কথায় কথায় জেনে নিতে চাইবে একদা তাঁদের কোনো শিশুপুত্র হারিয়ে গিয়েছিলো কী না?

কিন্তু হারিয়ে তো নয়।

ফ্যালাকে তো ফেলে দিয়েছিলো তার মা।

এসব ভাবতে গেলেই তো নতুন করে কষ্ট হয়।

তবু ওই 'নিজেকে দেখাটা' নেশার মতো টানে। সুযোগ পেলেই—

সুযোগ মানে. দোকানটা যখন নির্জন থাকে। যখন 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়' দিবানিদ্রার আবেশে ঝিমোয়।

কারণ ওই দেওয়াল জোড়া আয়নাখানা তো বস্ত্রালয়ের কাউণ্টারের সামনের দেওয়ালে সাঁটা!

একদা যখন মনোহর বিশ্বাস ওই 'বস্ত্রালয়'টি প্রতিষ্ঠা করতে বসেছিলো, এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলো, "দোকানে ঢুকতেই সামনের দেওয়ালে একখানা লম্বা আয়না ঝুলিয়ে দে। খদ্দের টানবে।"

প্রথমটা মনোহর বন্ধুর সে পরামর্শ কানে নেয়নি। উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলো, "ধুস! পোশাকের দোকান তো না। ধুতি-শাড়ি মাত্র। এখানে আবার আয়না কী হবে?"

বন্ধু বলেছিলো, "হবে রে হবে! কাজে লাগবে। দোকানের সামনে হেঁটে-যাওয়া লোকেরা হঠাৎ দোকানের মধ্যে নিজের চেহারখানা ফুটে উঠতে দেখলেই থামবে এবং হয়তো থামার জন্যেই লজ্জায় পড়ে দোকানে ঢুকে আসবে। এটা মানুষের একটা দুর্বলতা রে মনোহর! মানুষ নিজেকে দেখতে বড়ো ভালোবাসে।"

"কিন্তু দেওয়াল জোড়া একখানা আয়নার দামটি তো কম নয় বাবা।"

"সে দাম উসুল হয়ে আসবে। ওটা ধরে নে দোকানের ডেকরেশন কিংবা বিজ্ঞাপন।"

তো শেষ পর্যন্ত মনোহর বন্ধুর পরামর্শ মেনে নিয়েছিলো।

তা আয়নার দৌলতেই যে মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়ের ক্রমোন্নতি, একথা মনোহর মানে কিনা কে জানে, তবে ক্রমশই হয়ে চলেছে উন্নতি।

মনোহরের তো আবার এখন ধারণা, ওই 'দেবীচরণ' আসা পর্যন্তই বাড়বাড়ন্ত আরো বেড়েছে। ছেলেটা পয়মন্ত।

আসলে এই শহরটিরই এমন মহিমা, যে যেখানে যেমন বেসাতি নিয়েই একবার বসে পড়ুক, ফুলতে-ফাঁপতে শুরু করবেই।...আজ দেখছো 'আঙুল', তো দুদিন বাদেই দেখবে 'কলাগাছ'।...তা সে বসা ফুটপাথের ধারে 'ঘুগনি আলুর চপ ঝালমুড়ি' নিয়েই হোক, আর ফুটপাথের ওপর দড়ি টাঙিয়ে গামছা লুঙ্গির পসরা নিয়েই হোক।...আজ দোকানঘরে লোডশেডিং-এ মোমবাতি,-হ্যারিকেন, টির্বারি, আর কাল লোডশেডিং-এ 'জেনারেটর'।

এমন কী কেউ 'শনিঠাকুর' কী 'মনসা-শীতলা' নিয়েই ব্যবসা

ফাঁদুক।...আজ 'গাছতলা', দুদিন বাদে 'রেলিঙের ঘের', তারপরই 'পাকা ঘর', অতঃপর 'বিশাল মন্দির।'...এ তো আকছারই দেখছে সবাই।

মনোহরের এই 'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়ে'ও তো শুরু হয়েছিলো জোড়া কয়েক হেটোড়ুরে শাড়ি আর মোটা তাঁতের ধুতি দিয়ে। চটপটই—মোটা থেকে মিহি, হেটোড়ুরে থেকে সরেস ধনেখালি, জরিদার ঢাকাই টাঙাইল, শান্তিপুরী বেগমবাহার। দেড়-দু বিঘত বাবুধাক্কা মুগাধাক্কা ধুতি!

এদিকে ধাপে ধাপে মনোহর-গিন্নীর সংসারেরও ভোলবদল ঘটছে। রান্নাঘরে কালো কুচ্ছিত ঘুঁটে কয়লার বদলে 'ইণ্ডেন গ্যাস', শোবার ঘরে সাদাকালো টি. ভি-র বদলে রঙিন টি. ভি।

টুকু ইস্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজগার্ল।

তবু টুকুর মা-বাপ ওই কে জানে পেটে 'কতোটুকু বিদ্যেওলা' ছেলেটাকেই জামাই করবার স্বপ্ন দেখে চলেছে। বিদ্যে নেই, তাই বা বলা যায় কী করে? টুকুর সঙ্গে সঙ্গে তো সমানেই ওর বইপত্তর-গুলো নিয়ে পড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

টুকুর মানসিক গতি তার মা-বাপের চোখ এড়ায় না।

মাধ্যমিকের সময় তো টুকু একবার ধরেও পড়েছিলো, "দেবু, তুমিও 'প্রাইভেট মার্কা' হয়ে পরীক্ষায় বসে পড়ো। দেখবে ঠিক উতরে যাবে"

দেবু বলেছে, "মাথা খারাপ!"

তা ওকথা ছাড়া আর কী বলবে দেবু? দেবু মানে তো 'ফ্যালা'? তা—তার খেয়াল নেই, পরীক্ষায় বসতে হলেই ফর্মে সই-সাবুদ করতে নিজের নাম চাই, বাপের নাম চাই, চাই জন্ম-তারিখ, জন্মস্থান এবং এ যাবত কোথায় কীভাবে লেখাপড়া চালিয়েছে তার হিসেব ইত্যাদি ইত্যাদি। মাত্র 'দেবীচরণ অজানা' দিয়ে মনোহর বিশ্বাসকে বোঝানো সম্ভব হয়েছে বলেই কী ইউনিভার্সিটির কর্তাদের বোঝানো চলবে?

একদিন মা-বাবার সামনেই টুকু ফ্যালাকে প্রায় পেড়ে ফেলে-

ছিলো। বলেছিলো, আজ তোমায় বলতেই হবে হে দেবুচরণ, এর আগে অতোটা বয়েস পর্যন্ত কাটিয়েছো কোথায়।…এখান সেখান ঘুরে ঘুরে? ইয়ার্কি না কী? শৈশবকাল বাল্যকাল বলেও কী একটা কাল ছিলো না? তখন? থাকতে কোথায়? খেতে কাদের কাছে?

ফ্যালা বাধ্য হয়ে বলেছিলো, সে একজনেরা দয়া-ধর্ম করে থাকতে খেতে দিয়েছিলো। পালন-পোষণ করেছিলো।

তো সেই 'জনেদেরই' নামটি, আর জায়গার নামটি বলে ফ্যালো না বাবা? বাধাটা কোথায়? বলি চুরিচামারি করে ফেরার হওনি তো? তাই পরিচয় প্রকাশে এতো ভয়!

ধরে নাও তাই।

ধরে নিলে তো হবে না। সত্যিটাতো জানা দরকার।

কেন? জানার দরকারটা কী?

বাঃ। একজনকে দেখছি, সবাই ভালোটালো বাসছি, অথচ সে স্রেফ রহস্যময় হয়ে বসে থাকবে, এটা অস্বস্তির নয়?

ফ্যালা বলেছিলো, তোমাদের ওই খাঁচায় ঝোলানো টিয়া-পাখিটা বলেছিলে হঠাৎ একদিন উড়ে এসে জানলায় বসেছিলো। ওর ঠিকুজি-কুলুজি হাড়হদ্দ কিছু জানো? জানো না। শুধু জানো, একটা টিয়াপাখি। ছোলা পেলে ছোলা খায়, ছাতু পেলে ছাতু খায়, ছানা-মাখন পেলেও দিব্যি খেয়ে নেয়, ব্যস। তো ওকে নিয়ে তোমাদের কী খুব কিছু একটা অস্বস্তি আছে?

বাঃ। চমৎকার। ওর সঙ্গে তোমার তুলনা?

একই ব্যাপার। একটা পোষা প্রাণী। প্রাণীটা একটা মানুষ। এই পর্যন্ত।

মনোহর এদের কথার মাঝখানে হেসে উঠে বলে, ওর সঙ্গে তুই কথায় পারবি না টুকু।

তবু মনে মনে আশা রাখে, ওই টুকুই একদিন আদায় করতে পেরে উঠবে উড়ো পাখির ঠিকুজি-কুলুজি হাড়হদ্দ।

এখন আরো কিছুদিন সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখা যায়! কতোই বা বয়েস হলো টুকুর? তাছাড়া 'বয়েস' সম্পর্কে যেন

তেমন জ্ঞান নেই মেয়েটার।

কিন্তু 'মেয়েটার' নিজের জ্ঞান নেই বলে কী, সংসারের আর সবাই জ্ঞানগম্যিহীন ?···

মনোহরের বিয়ে-হওয়া মেয়েরা মাকে চিঠি দিলেই লেখে, "টুকুর বিয়ের কথা ভাবছো-টাবছো ? আমাদের তো ওই বয়েসে কবে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিয়েছিলে। 'কোলের মেয়ে' বলে খুব মায়া, তাই না ? যাক—বলি যে আমার হাতে একটি ভালো পাত্র আছে—"

বড়ো মেজ সেজ তিনজনেরই ভাষা আলাদা হলেও—বক্তব্য একই। তাদের শ্বশুরকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ভালো পাত্র আছে। জাতপাত-কুলশীল-গণগোত্র সবকিছুর মিল।···

মনোহর-গিন্নী চিঠি এলেই বরকে দেখায় আর বলে, দ্যাখো বাপু ভালো করে ভেবেচিন্তে। মেয়েরা এতো হিতৈষী হয়ে আগ্রহ দেখিয়ে বলছে—এখন অ্যালাকাঁড়ি দিয়ে শেষে, পস্তাবে না তো ?

মনোহর বলে, তার মানে তুমিও চাইছো টুকুকেও আর তিনটের মতো 'পর' করে দিয়ে চোখছাড়া করে ফেলি ! আর শেষ জীবনে বুড়োবুড়ি দু'জনে ডুগডুগি বাজিয়ে দিন কাটাই !

আমি কিছুই বলিনি। আমারই কি অসাধ যে টুকু আমাদের কাছেই থাকুক। কিন্তু আসল ঘরে যে মুষল নেই। 'দেবু'কে তো আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলে না।

তুমিও পারোনি।

আমি বলি, আর কিছুদিন যাক না ! এতো ব্যস্তর কী আছে !

সে তো আমিও বলি। তোমার মেয়েরাই তো ব্যস্ত হয়ে পড়ে উৎপাত করছে।

মনোহর তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, সেটা করছে হিংসেয়। ওই যে ছোটোবোনটা এখনো হেসেখেলে বেড়াচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, এটা সহ্য হচ্ছে না।···ওদের মতো কুড়ি বছরেই ষষ্ঠী বুড়ি হয়ে বসে, হাড়গিন্নীর মতো আচরণ করলেই বাঁচে। না না, ওদের কথায় কান দিও না।

অতএব কান দেয় না টুকুর মা !

এদিকে অবোধ টুকু প্রেমসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে বসে থাকা ফ্যালার একটা রোগ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

ভাবে অনেকে গান গাইতে পারে, বাঁশি বাজাতে শেখে, হতভাগা ফ্যালা কিছুই পারে না। এই খোলা ছাদে বসে যদি বাঁশি বাজাতে পারতো।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে বসলো ফ্যালা যে বাঁশি বাজাতে না শিখলেও বাঁশি আপনি বেজে উঠতে পারে!

হঠাৎ ছাদের অন্ধকারে টুকুকে আবিষ্কার করে হতভম্ব হয়ে গেলো 'দেবু'।

একী, তুমি এখানে!

টুকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, কেন কী হয়েছে? ছাতটা তোমার কেনা না কী?

আমার কেনা হতে যাবে কেন? তোমাদেরই তো কেনা। কিন্তু এতো রাত্তিরে একা —

একা আবার কী তুমি রয়েছ বলেই তো আসতে সাহস হলো। হি হি—ভূত তোমায় দেখে ভয় পেয়ে উঁকি দিতে আসবে না।

ফ্যালা এখন অনেক পরিণত, অনেক বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে। ফ্যালা তাই অবাক হয়ে ভাবে, এটা কী টুকুর সত্যিই অদ্ভুত সরলতা? না, অভিনয়? মতলবটা কী ওর?

তাই ফ্যালা গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, ভয় কী শুধু ভূতের?

বাড়ির মধ্যে আবার কিসের হবে?

তুমি এতো বড়ো হয়েছো, এ বুদ্ধি হয়নি, এভাবে একা ছাতে আসা নিন্দের।

আবার বলে 'একা! একা!' নিজেকে একটা লোক মনে করো না বুঝি? হি হি।

টুকু!

এই প্রথম ফ্যালা টুকু বলে নাম ধরে ডেকে ওঠে।

'ছোড়দি' আর 'আপনি'টা অবশ্য ছেড়েছে অনেকদিন। ও দুটো শব্দ বাদ দিয়েই সাবধানে কথা চালায়।

কিন্তু প্রথম এই ভাবটা কিন্তু কোমলও নয় মধুরও নয়। প্রায় ধমকের সুরেই। বলে উঠলো, টুকু! সত্যিই কি তুমি কিছুই বোঝো না?

টুকুও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে ওঠে, সেই কথাটা আমিও তোমায় জিগ্যেস করছি।

ফ্যালা একটু কেঁপে ওঠে।

তারপর কী ভেবে শক্ত গলায় বলে, বুঝে কী লাভ?

লোকসানটাই বা কী? নিজেকে তুমি খুব একখানা মস্তবড় বলে ভাবো বুঝি?

বোকার মতো কথা বোলো না টুকু! আমি যে কী তা তুমি নিজেই ভালো করে জানো। মুখ্যু গাধা তোমার বাবার দোকানের একটা কর্মচারী মাত্র।

বিনা মাইনের!···তা সে হিসেবে মুখ্যু গাধাই!

ব্যস। তাহলে তো হয়েই গেলো। যাক, এখন হয় তুমি নেমে যাও, নয় আমিই নেমে যাই।

এতো ভয় কেন? আমি তোমায় কামড়ে দেবো না কী?

ছিঃ। এভাবে কথা বলছো কেন?

তুমি বলাচ্ছ তাই বলছি।···শোনো—আমি আজ সহজে নেমে যাচ্ছি না। আমি আজ জেনে ছাড়তে চাই আসলে তুমি কে? তোমার—

ফ্যালা হতাশ গলায় বলে, 'আমি কে', সেকথা যে আমি নিজেই জানি না টুকু!

আবার সেই কথার প্যাঁচ! বলি সেই সেদিনকে বাবা যেদিন তোমায় পেয়েছিলো। তুমি বুঝি তোমার ওই লম্বা চওড়া শরীরখানা নিয়ে হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়েছিলে? তার আগে কিছু ছিলো না?

ফ্যালা আস্তে বলে, এর উত্তর যদি কাউকে দিই, তো তোমাকেই দেবো টুকু। কিন্তু আজ নয়। আজ তুমি যাও।

যদি না যাই ?

তাহলে আমাকেই যেতে হবে।

ওঃ! কী নিষ্ঠুর!

বলে ছিটকে সরে গিয়ে নেমে যায় টুকু।

সেদিন যায়।...আবার পরদিন আসে।...তার পরদিন।

কিন্তু ফ্যালার ছাতে উঠে আসা বন্ধ করে ছাড়ে টুকু।

টুকুর এতো দুঃসাহস কেন ?

টুকুর প্রাণে ভয় নেই কেন ?

ফ্যালা তাহলে কী করবে এখন ?

দিনগুলো একরকম চলে যাচ্ছিলো ফ্যালার।

সর্বদা একটা যন্ত্রণাবোধের ভাব যেন কমে আসছিলো, টুকু নামের ওই বোধবুদ্ধিহীন ভয়ডরহীন মেয়েটা নতুন করে আবার ফ্যালাকে সেই সর্বদা কুরে কুরে খাওয়ার যন্ত্রণাটাকে জাগিয়ে তুলে বসেছে।

ফ্যালার ভাগ্যটাই যন্ত্রণার।

কী দরকার ছিলো টুকু, তোমার এমন বেহিসেবি কাণ্ড করে বসবার ? তুমি কেন মনে রাখবে না এই হতভাগা লোকটা তোমার বাবার দোকানের চাকর ছাড়া আর কিছু নয়।...তোমার মা তাকে দেখে প্রথমেই জিগ্যেস করেছিলো, "রান্না করতে জানিস ?...মসলা পিষতে পারিস ?"

এইরকম একটা যন্ত্রণাচ্ছন্ন সময়ে হঠাৎ এ সংসারে একটা ঘটনা ঘটলো। ঘটনা না বলে 'আবির্ভাব' বললেই ভালো হয়।

দোকান বন্ধর দিন, ফ্যালা আর মনোহর বাড়িতে ভিতরের ঘরে বসেই দোকানের হিসেবের খাতাপত্র দেখছে, সহসা এক উদ্দাম কণ্ঠধ্বনি, "কী মামী, ভূত দেখার মতো চমকে উঠলে যে গো ? ভেবে নিশ্চিন্দি ছিলে বোধহয় ব্যাটা গোপলা মরেহেজে ভূত হয়ে গেছে।"

মনোহর ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে 'কার গলা পাচ্ছি' ?...বলে।

ফ্যালা খাতা গুটিয়ে খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়ে দেখে কে একজন এসেছে। হৈ হৈ করে কথা বলছে।

বললো, মামাও দেখছি তাই। যেন ভূত দেখলো। এ বড়ো শক্ত জান মামা। সহজে পৃথিবী থেকে নড়বে না।

থাম তো। যতোসব বাকতাল্লা। এতে দিন পরে এসেও সেই একই আছিস দেখছি।

ভদ্রলোকের এক কথা, বুঝলে মামী? তো মামী কাঠ-পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? চায়ের জলটল চড়াতে যাচ্ছো না?

সে কথা তোকে ভাবতে হবে না, সে হচ্ছে। বলি এতোদিন ছিলি কোথায়?

কোথায় নয়?

তো এখন এলি কোথা থেকে?

এই ঘুরতে ঘুরতে কোনোখান থেকে ছিটকে।

তা করিসটা কী?

কী নয়?

মামা বলে ওঠে, তো হঠাৎ চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশঘর ছেড়ে অমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবার মানে?

চাকরিটা কী চাকরির মতো ছিলো মামা? হঠাৎ একদিন মনের ঘেন্নায় সেলাম ঠুকে বেরিয়ে পড়লুম। বাপ তো কোনকালে সগগে গিয়ে বসে আছেন। মাও তো খেল্ খতম করে কেটে পড়লো, কার জন্যে পিছুটান? যেখানটায় থাকবো সেখানটাই দেশ। তো তোমাদের আশীর্বাদে এখন করে তো খাচ্ছি মন্দ নয়।

ফ্যালা এতোক্ষণ লোকটাকে শুধু এমনি দেখছিলো।

লম্বা খটখটে পেটানো শরীর। মুখটা কাঠকাঠ, চুলগুলো ঝাঁকড়া, বয়েস তিরিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। তার থেকেও ওঠানামা করতে পারে। এই এক ধরনের চেহারা থাকে, যৌবনের লাবণ্যও বোঝা যায় না, আবার বয়েসের ভারও চাপে না।

কিন্তু ওটা কী বললো লোকটা?

'মা কবেই খেল্ খতম করে চলে গেছে।' খেল্ খতম মানেই তো মরে যাওয়া। সে-ই কথাটা বলছে অমন হেসে হেসে? ছিঃ।

কিন্তু ফ্যালা 'ছিঃ' দিলেও গোপালের মামা-মামী ছিঃ দেয় না। সে নিয়ে কিছু ভাবেও না। বলে, তো বিয়ে-থাওয়া করেছিস

না কী ?

বিয়ে ! স্বপ্ন দেখছো না কী গো মামী ! বলি মা-বাপ-মরা হতভাগাটার বিয়েটা দেবে কে শুনি ?

মামী হঠাৎ জোর গলায় বলে ওঠে, তো আমরাও তো রয়েছি। আপন সহোদর বোন না হলেও তোর মা তোর এই মামার সম্পর্কে বোন ছিল তো বটে। জ্ঞাতিবোন কী বোন নয় ?

ওবাবা ! তা আবার নয় ? মা তো এই 'মনোদা' বলতেই অজ্ঞান হতো। আর এই হতভাগা গোপ্‌লার তো এটাই ছিল আসল মামার বাড়ি। যতো আবদার উৎপাত তো তোমরাই সয়ে এসেছো চিরদিন। কাকা জ্যাঠা আর আপন মামারা তো জন্মজীবনে গলাভরা উপদেশ ছাড়া আব কিছুই দেয়নি।

তো বেশ, তাহলে আমরাই দেখেশুনে বিয়েটা দিই।

ক্ষেপেছো ! উড়ো পাখির জীবনে দিব্যি আছি বাবা। সাধ করে পায়ে বেড়ি পরতে আছে ?

মামী ঠিকরে উঠে বলে, আহা ! ছেলের কথার কী বাঁধুনি ! 'পায়ে বেড়ি'। এই বেড়িটি থাকে বলেই ঘরসংসার, জীবন। তা নইলে তো সবই ফোক্কা ! তো শুধো না তোর মামাকে, এই তোর মামীটি ওনার পায়ের বেড়ি ?

মনোহর হা হা করে হেসে উঠে বলে, সর্বনাশ। পায়ের বেড়ি কী গো, বরং বলো যে, মাথার পাগড়ি। মাথায় একবার চাপিয়ে ফেললেই বাস। ওই যে কী বললো তোর মামী, 'ঘরসংসার জীবন'। তাই। তো রোজগারপাতি তো ভালোই করছিস মনে হচ্ছে—

ওই তো বললুম তোমাদের আশীর্বাদে—

হুঁ। খুব বিনয়-টিনয় করতে শিখেছিস দেখছি। তো তোর মামীর কথামতো মাথায় একখানা পাগড়ি চাপিয়েই ফ্যাল না। পায়ের বেড়ি মাথার পাগড়ি দুই সমান।

ফ্যালা তাকিয়েই আছে। লোকটার কথাবার্তায় গোড়ায় যেমন একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছিলো, এখন আবার শুনতে শুনতে সে বেশ আকৃষ্টও হচ্ছে।

ফ্যালা দেখলো লোকটার কাঠকাঠ মুখটায় যেন হঠাৎ একটু কোমল আভা ফুটে উঠলো। ঘাড়টা চুলকে বললো, মাঝে মাঝে যে সেটা একেবারে ভাবি না তা নয় মামা। তবে আবারও মনে হয় মা তো হাওয়া। কার জন্যে বিয়ে! 'ছেলের বৌ' দেখে আহ্লাদ করবে কে? গড়েপিটে মানুষ করবে কে? দূর! থাক ওসব।

ফ্যালা লোকটাকে ভালোবেসে ফেললো!

ঘণ্টা কয়েক পরে দেখা গেলো দালানের মেঝেয় পাশাপাশি তিনখানা আসনে তিনজন খেতে বসেছে। মাঝখানে কর্তা মনোহর বিশ্বাস, ডাইনে-বাঁয়ে তাঁর ভাগ্নে আর পুষ্যিটি। 'দেবু' অথবা ফ্যালা।

ফ্যালা কেন তার থেকে বেশ অনেকখানিটা বয়েসে বড়ো ওই অপরিচিত লোকটাকে ভালোবেসে ফেললো?

বলা শক্ত।

ভালো না বেসে ফেললে এভাবে তার সঙ্গে খেতে বসতে পাবা যেতো। কী? টালবাহানা করে এড়িয়ে যেতো।

ফ্যালা ইতিমধ্যে জেনে গেছে লোকটাব পুরো নাম হচ্ছে আনন্দ-গোপাল। আনন্দগোপাল সরকার। অনেক ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়ে আপাতত একটা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরিতে অধিষ্ঠিত। সেই বাবদই ঘুরছে। কোম্পানিটা ভালো। গোপাল হেসে হেসে বলেছে, কোম্পানি তো এইসব ট্যুর বাবদ বেশ ভালো হোটেলেই খাওয়া-থাকার খরচটা দেয়।···তবে এবাবে ভেবে ঠিক করলুম, কলকাতায় যখন মামার বাড়ি, তখন এই পাঁচ-সাতটা দিন মামার স্কন্ধেই চাপিগে। মামার বাড়ির আদরটাও খাওয়া হবে, ক'দিন আত্মজনের সঙ্গে থাকার সুখটাও জুটবে, ওদিকে কোম্পানির বরাদ্দ টাকাটাও স্রেফ পকেটে উঠবে। রথ দেখা কলা বেচা না কী যেন বলে, তাই আর কী!

হা হা হাসি।

এই হাসিটাই ফ্যালাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, তাছাড়া—এমন স্পষ্টবক্তা। বানিয়ে গুছিয়ে কথা বলার চেষ্টা নেই। তাছাড়াও যে লোক ভাবে, 'মা নেই বিয়ে করে কী হবে? বৌ দেখে আহ্লাদ

করবে কে', তার প্রেমে না পড়ে উপায় আছে ?···যেন কোথায় কোনখানে কোনো একটি বীণার তারটি একই সুরে বাঁধা ! কিন্তু মারা গেলেও সে মা তো ওর সত্যিকার মা ছিলো ।

'কথার রেলগাড়ি' গোপালের কথার বিরাম নেই। চালিয়েই যাচ্ছে, মামা যে দেখছি এখনো সাবেকি চালেই আছো । ভুঁয়ে আসন পেতে থেবড়ি গেড়ে বসে খাওয়ার চল এখন আর কোথাও আছে না কী ? কিছু না জোটে একটা প্যাকিং কাঠের টেবিলও বানিয়ে নেবে ।

টুকু এযাবত চুপচাপই ছিলো। চা বানিয়েছে, মায়ের হাতে সাহায্য করেছে, এখন মশলার কৌটো হাতে নিয়ে মায়ের পিঠ ঘেঁষে বসে আছে। গোপালের কথায় চট করে বলে ওঠে, তা কী করবে ? প্যান্ট-পায়জামা পরে তোমার ওই মাটিতে থেবড়ি গেড়ে বসতে অসুবিধে নেই ? আর ওভাবে মাটিতে বসে তোয়াজ করে খেতে খেতে ভুঁড়িটি কেমন বাড়ে, বাবাকে দেখেই তো বোঝো !

গোপাল বলে ওঠে, আরে এটাকে তো এতোক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। টুকু না ? এতো বড়ো হয়ে উঠেছিস ?···'ভূতের গল্প বলো, ভূতের গল্প বলো', বলে কী ঝুনোঝুনিই না করতিস। মনে আছে ?

টুকু বলে, থাকবে না আবার কেন ? দু'বছর বয়েসের কথাও আমার মনে আছে ।

ফ্যালা শোনে। ফ্যালা বিচলিত হয় ।

ফ্যালার স্মৃতিশক্তিটা কী তাহলে যাচ্ছেতাই রকমের কম ? দু'বছর বয়েসের কথা কী তার মনে আছে ? ··কিন্তু কবে কখন যে ফ্যালার দু'বছর বয়েস ছিলো কে তাকে বলতে গেছলো ? ইস্কুলে ভর্তি হবার সময় ফ্যালার বয়েসের কথা উঠেছিলো। ফ্যালা শুনতে পেয়েছিলো, "যেদিন ও আমার কোলে আসে সেটাই ওর জন্মদিন। সেই হিসেব ধরেই ইস্কুলের খাতায় বয়েস লেখাও।" সে কথার মানে তখন বুঝতে পারেনি ফ্যালা। 'কোলে আসা' মানেই তো জন্মানো। তাছাড়া আর কী ?···কিন্তু সেই অন্যরকম কোলে আসার সময়টা যে ফ্যালা কতো বড়ো ছিলো, তাই কী কেউ বলেছে

ফ্যালাকে ?

না না। ফ্যালাকে অন্ধকারে ফেলে রেখে মজা দেখবে বলেই বরাবর সবাই চক্রান্ত করেছে।

ফ্যালা তো ভেবে চলেছে, এদিকে গোপ্‌লা তার রেলগাড়ি চালিয়ে চলেছে। ফ্যালার যখন চমক ভাঙলো, শুনতে পেলো ওই গোপ্‌লা বা আনন্দগোপাল বলছে, "তো মামার তো বলতে নেই ঈশ্বর-ইচ্ছেয় ভুঁড়িটি 'নেওয়াপাতি' থেকে গোয়ালন্দের তরমুজে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু মামীর এমন অম্বলের রুগীর মতন চেহারা কেন ?"

টুকু ফট করে বলে ওঠে, 'অম্বলের রুগী' বলেই। রোগ একেবারে মোক্ষম।

হুঁ। দেখে তাই মালুম দিচ্ছে বটে। তো মামা, মামীর একটা পলা ধারণ করাও না। খুব কাজ দেবে।

পলা !

হ্যাঁগো। আকাশ থেকে পড়লে যে। তেলের পলা বলছি না কী ?···পলা মানে 'প্রবাল'। ছ রতি প্রবাল দিয়ে একটা আংটি গড়িয়ে দাও। দেখো ওসব অম্বল-ফম্বল বিদেয় হয়ে যাবে। আর—তার সঙ্গে যদি একটা গোমেদ ধারণ করাতে পারো, তাহলে আর দেখতে হবে না, একেবারে অব্যর্থ !

···অসুবিধে কী ? গ্রহশান্তির রত্নের দোকানে গেলেই—

মামী অবাক হয়ে বলে, এসব আবার তুই শিখলি কবে ?

শিখেছি মামী শিখেছি। এ দুনিয়ায় চরে খেতে হলে অনেক কিছুই শিখতে হয়।···সেবার কিছুদিন বেনারসে একটা হোটেলে থাকতে হয়েছিলো, তো ভাগ্যক্রমে, সেই হোটেলেই একজন নামকরা জ্যোতিষী, যাকে বলে 'রাজজ্যোতিষী'। ব্যস, ধর্ণা দিয়ে পড়লাম, "প্রভু, শেখাতেই হবে।" তো সহজে কী আর শেখাতে চায় ? তবে আমিও ছাড়বার পাত্র নয়। শিখে নিলাম ওর খানিকটা বিদ্যে ! তবে হাত দেখাটা যতো কম সময়ে শেখা যায় কোষ্ঠীবিচার-টিচার-গুলো ঠিক ততোটা কম সময়ে হয় না।

অ্যাঁ। গোপালদা ! তুমি হাত দেখতেও জানো ? টুকু বলে ওঠে।

গোপাল মাছের বড় কাঁটাটা চিবোতে চিবোতে বলে, আরে বাবা, তেমন বেশী কিছু কি আর ? তবে—

ওতেই হবে। ওতেই হবে। ও গোপালদা, শীগগির খাওয়া সেরে নিয়ে ওঠো। এক্ষুণি আমার হাত দেখে দাও।

গোপাল হেসে হেসে বলে, কী দেখার জন্যে এতো তাড়া ? কবে বিয়ে হবে ?

আহা ! বিয়ে ছাড়া জগতে আর কিছু জানবার নেই বুঝি ? পরীক্ষায় কী রেজাল্ট হবে, ভবিষ্যতে কী হবো—

কিন্তু শুধু টুকুই বা কেন, কেউ হাত দেখতে জানে শুনলে কে না উৎসাহী হয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে ?

প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই এ এক দারুণ দুর্বলতা।

যে মুখে বলে, 'আমি ওসব মানিটানি না' সেও পরে বলে, "আচ্ছা দেখি তো কেমন বলতে পারেন ? দেখুন দিকি আমার হাতটা।"

হাত দেখিয়ে মনোহর তার দোকানের পরিণাম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, মনোহর-গিন্নী মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে। টুকু তো আগেই বলেছে, পরীক্ষার রেজাল্ট, তারপর ওইসব নিয়ে হৈ-হল্লোড় করতে করতে টুকু কিনা হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা গোপালদা, এই দেবুর হাতটা একবার দেখে দাও তো—

দেবু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না, আমার দরকার নেই।

মনোহর আলগাভাবে বলে, তা দেখা না বাপু একবার। ভবিষ্যতে কী হবি-টবি—

কিন্তু দেবু রাজী হয় না।

আমার আবার ভবিষ্যৎ ! তাতে আবার দেখবার কী আছে ?···

বলি হাতের রেখায় বিয়ে-টিয়ে আছে কিনা, থাকলে সেটি কবে কী রকম, সেটাও তো জানতে পারিস বাবা।

আমার ওসব বাজে জিনিস জানবার দরকার নেই।

এখন ফ্যালা কলকাত্তাই কথাটথা শিখে ফেলেছে, উচ্চারণে তেমন গ্রাম্য টান নেই।

অদ্ভুত একটা লজ্জায় ফ্যালা হাত দেখাতে চায় না। কিন্তু তার

মনের মধ্যে একটা আকুল আবেগ তোলপাড় করতে থাকে।…হাতটা দেখালে আমি তাহলে জেনে যেতে পারি আমি কে। কী আমার পরিচয়! কেউ কোথাও আছে কিনা আমার! আর—কেন আমার জন্মদাত্রী মা আমায় অন্যের কোলে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলো!

বাকি সারাটা দিন ফ্যালা মনে মনে নিজেকে গালে মুখে চড়ায়, কেন তখন বললুম আমার দরকার নেই। কী ভুল। কী বোকামি।

সারাদিন যদি কাঁকড়াবিছে কামড়াতে থাকে, কতো আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারে মানুষ?

রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর সে দংশন আরো দুর্বার হয়ে ওঠে।

বিছানায় শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়।

ছাতে চলে গিয়ে মাথায় খোলা হাওয়া লাগাবে ফ্যালা? এতো রাতেও কী ছাতের সেই 'ভয়' এসে হানা দেবে?

এ বাড়িতে নীচের তলায় খালি ঘর অরো থাকলে, সব ঘরে তো আর পাখা নেই।…এই একটা ঘরেই আছে, যে ঘরে দেবীচরণের শোবার ব্যবস্থা।…

মনোহর ভাগ্নেকে চুপিচুপি বলেছিলো, ওর সঙ্গে এক ঘরে শুতে দিলে কিছু মনে করবি না তো বাবা?

ভাগ্নে অবাক হয়ে বলেছিলো, মনে করবো? কেন? ও কী দোষ করলো? অমন 'হ্যাণ্ডসাম' একখানা ছেলে!

মনোহর ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, দোষ কিছু করেনি। আসলে তোর মামীই ভয় পাচ্ছিলো, যতোই হোক দোকানের কর্মচারী!

মনে তো পড়ছে প্রথম যখন এসেছিলো ছেলেটা, তাকে সিঁড়ির তলায় শুতে দেওয়া হয়েছিলো। তাই শুয়েছে ফ্যালা অনেকগুলো দিন। ক্রমশ গুণের পুরস্কার হিসাবেই ক্রমোন্নতি। পাখাদার ঘরে প্রোমোশান।

পাশের ঘরটায় পাখা নেই। সেখান থেকে জোর করেই এই 'বৈঠকখানা' নামাঙ্কিত পাখাদার ঘরখানায় এনে তোলা হয়েছে ফ্যালাকে।

তা তুলবে না কেন ? ওকে যে আরো অনেক—অনেকখানি উঁচুতে তুলে নেবার পরিকল্পনা বিশ্বাস-দম্পতীর। তাছাড়া যে মাইনে নেয় না, তাকে চাকরই বা বলা যায় কোন সূত্রে ?···

তো—টুকু আবার আড়ালে দেবুকে বলেছে, এই দেবু। শুনলাম ওই বাক্যবাগীশ গোপালদাকে তোমার ঘরে ঢোকাবার তাল হচ্ছে। তার মানে সারারাত ঘুমের দফা রফা। ও তো নির্ঘাৎ সারারাতই বম্বেমেল চালিয়ে যাবে।

দেবু বলেছিলো, তাই যদি হয়, ক্ষতি কী ?

ক্ষতি আর কী ? ঘুমের ব্যাঘাত।

সে তো অনেক কারণেই হয়। তাছাড়া উনি হলেন বাড়ির লোক। বরং উনিই হয়তো অপছন্দ করতে পারেন একটা চাকর-বাকরের সঙ্গে শুতে।

চাকরবাকর ?···দেবু !

তাছাড়া আর কী বলো ? আমার ইতিহাসটা কী আর উনি না শুনবেন ? বা না শুনেছেন !

টুকুর মুখে হঠাৎ একটা রহস্যময় হাসির আভা ফুটে ওঠে। তা সেই চাকরবাকরকেই তো 'জামাই' করার মতলব ভাঁজা চলছে—

কী ? কী ? কী বললে ?

যা ঠিক তাই বলেছি।

অসম্ভব। যা ইচ্ছে বলবে না বলছি টুকু।

বলে ফ্যালা প্রায় ছিটকে সরে আসে। টুকুর কী এসব চাল কি ?···ফ্যালার মন বুঝতে চায়। টুকু কী তাকে ফাঁদে ফেলে বসবে ?

ছাতে ওঠবার মানসেই উঠে পড়ে ফ্যালা ! আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে খায়, আর চমকে ওঠে গোপালের গলার স্বরে। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো না লোকটা !

কিন্তু গলার স্বরে তো সেই অঘোরের আভাস নেই।

কিছু মনে কোরো না ভাই, তোমায় তুমিই বলছি—মনে হচ্ছে ঘুমোতে পাচ্ছো না। জেগেই আছো। কেন বল তো ?

ফ্যালা নিজস্বভাবে ফট্ করে বলে ওঠে, তা সেটা তো দেখছি

আপনার ব্যাপারেও খাটে। নিজেও তো ঘুমাননি!

তা সত্যি। আসলে কোম্পানিকে একটা হিসেব দেওয়া দরকার। সেটা কোন ভাষাতে করবো মনে মনে তার খসড়া ভাঁজছি।

বাঃ, হিসেব তো হিসেবের ভাষাতেই দেবেন।

তা তো দেবো। আমার আবার ইংরিজিটা তেমন আসে না। চিঠিপত্রয় জুত করতে পারি না। কিন্তু তোমার সমস্যাটা কী?

আমার তো জীবনটাই সমস্যা দিয়ে তৈরি। ফ্যালা হঠাৎ সরে এসে গোপালের বিছানার একধারে বসে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, "আচ্ছা সত্যিই হাত দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন আপনি? আমার হাতটা একবার দেখবেন?"

সেরেছে।

গোপাল মনে মনে হাসে, যা হয় আর কী! তখন 'না না' করে এখন পস্তাচ্ছেন বাবু।

কিন্তু এতো আবেগ উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্তমতো ভাব কেন?

একটু হেসে বলে, এই রাতদুপুরে? হাত দেখা?

রাত্তিরে দেখা যায় না? কিন্তু আমার যে খুব দরকার।

ফ্যালার গলার স্বরে আশাভঙ্গের শিথিলতা।

গোপাল তেমনিভাবে একটু হেসে বলে, ব্যাপারটা কী বল তো? প্রেমে-ট্রেমে পড়ে বসেছো না কী?

আসলে সারাদিনে টুকুকে সে ওয়াচ করেছে এবং তার ভাবান্তরটা চোখ এড়ায়নি গোপালের।

ফ্যালা কিন্তু এ পরিহাসে আরো উত্তেজিত হয়। ক্ষোভের গলায় বলে ওঠে, কী যে বলেন? এ আমার জীবনমরণের সমস্যা গোপালবাবু।

বাবু নয়, বাবু নয়, 'গোপালদা'। তো সেটা কী ব্যাপার বল তো?

ফ্যালা এযাবত যে কথা কাউকে বলেনি, বলতে পারেনি, সেই কথাটা কী তাহলে এইমাত্র একদিনের চেনা লোকটার কাছে বলে বসবে? তো, তাই তো বললো। ভয়ানক আবেগ-আলোড়িত-ভাবে বলে উঠলো, আচ্ছা বলুন তো, একটা মানুষ এই পৃথিবীতে লোক-

সমাজে চরে বেড়াচ্ছে, বেড়াতে হচ্ছে—অথচ সে জানে না সে কে ? কী তার পরিচয় ? কে তাকে পৃথিবীতে এনেছিলো—তাহলে তার কী যন্ত্রণা ?

আনন্দগোপাল একটু থমকায়।

মামা-মামীর কাছে জেনেছে, ছেলেটাকে ভগবান তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন। আর বিশদ কিছু শোনেনি। তবু সাবধানে বলে, তা যন্ত্রণা তো বটেই—

ভীষণ যন্ত্রণা। দিনরাত্তির কুরে কুরে খেয়ে চলেছে সে যন্ত্রণা। যেন এ পৃথিবীতে সে থেকেও নেই। তার কোনো দাবি নেই থাকবার। দোহাই আপনার গোপালদা, আপনি টর্চ জেলেও দেখুন একবার। বলুন, আমার জীবনের ইতিহাস কী ?

গোপাল আস্তে ওর পিঠে একটা হাত রাখে। গভীর বেদনায় বলে, সত্যি সে সব বলতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই ভাই। ...আসলে আমার ওটা একটা লোক জমানো চালাকি, ধাপ্পা।

কী ? কী বললেন ?

বলছি সত্যিই আমি কিছুই জানি না। তোমাদের এই গোপালদার হচ্ছে স্রেফ ফোর টোয়েন্টি-র কারবার।...শুধু গোপাল সরকার কেন, এই যে শহর জুড়ে এতো হাত দেখা কোষ্ঠী দেখা জ্যোতিষী জ্যোতিঃশাস্ত্রী জ্যোতিষার্ণবদের রমরমা ব্যবসা, তাদের ক'জন যে সত্যি সে বিদ্যেয় পারদর্শী তা ভগবানই জানেন।

ওঃ। তার মানে ওইসব জ্যোতিষ-টোতিষ কিছু না ?

সবই 'কিছু না' বলবার দুঃসাহস নেই ভাই, তবে বেশীর ভাগই স্রেফ ব্যবসা। কেউ কিছু সঠিক বলতে পারে না।

ফ্যালা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে।

তাহলে আমার কিছু হবে না ?

আসলে ফ্যালা সেই কবে থেকেই যেখানে যতো জ্যোতিষ-কার্যালয় দেখে, আর যেখানে যতো ওই নিয়ে বিজ্ঞাপন দেখে ততোই স্পন্দিত হয়। ভাবে এরাই কী তবে কেউ ফ্যালার চোখের সামনের চিরকাল ঝুলে থাকা অন্ধকারের পর্দাটা সরিয়ে দিতে পারে ? ফ্যালা ওদের কারো কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে বলবে 'আমাকে আপনারা একটু

আলো দেখান। বলে দিন আমি কে?’

বহুবারই ভেবেছে, ওই ধরনের সাইনবোর্ড দেখলেই থমকে দাঁড়িয়েছে। হাঁ করে দেখেছে, লোকে আসছে যাচ্ছে ঢুকছে বেরোচ্ছে, কিন্তু ভেবে পায়নি কীভাবে ওই ঢুকে যেতে পারা যায়! গিয়ে কী বলতে হয়! এতোজনের সামনে কী করে বলা যায় নিজের একান্ত লুকোনো কথা! যদি অন্যেরা শুনে হেসে ওঠে? যদি পাগলছাগল ভাবে?

সাহস পায়নি ফ্যালা।

ফ্যালা যে এসবের কিছুই জানে না।

আজ হঠাৎ ফ্যালা এদের এই আত্মীয়টির মধ্যে ওই গুণ আছে জেনে যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। অথচ তখন লজ্জায় ভয়ে ‘না না’ করেছে।

কিন্তু এখন একে একা পেয়ে ফ্যালা যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বসে-ছিলো। ফ্যালা তাই এতোদিনের পাথর-চাপানো বুকটাকে খুলে মেলে ধরতে চাইছিলো।...

এ লোক সত্যবাদী খোলামেলা। এর কাছে মনটাকে মেলে ধরতে চিরকালের তীব্র প্রতিরোধটা যেন এলিয়ে যায়। তাই কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে ওঠে, আচ্ছা বলুন তো, একটা লোক, লোকসমাজে চরে বেড়াচ্ছে অথচ জানে না সে কে? তার কী যন্ত্রণা?

কিন্তু এ কী হলো?

এ যে বলছে, সত্যি কিছু জানে না। বলছে এসব ওর ধাপ্পা। লোক-জমানোর কায়দা।...বলছে এই যে এতো সব দেখো—বেশীর ভাগই ব্যবসা! তাহলেও উথলে কান্না আসবে না?

গোপাল একটুক্ষণ পরে আস্তে ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলে, তোমার কথা তো আমি কিছুই জানি না। যদি আপত্তি না থাকে আমায় বলবে? মামা তো বলছিলো, মামাও কিছু জানতে পারেনি তোমার কাছে।

ফ্যালা উঠে বসে আস্তে বলে, জানাবার মতো যে নয় গোপালদা! আপনি ভাবুন একটা ছেলে জ্ঞান থেকে জানে, ‘এইটা আমার বাড়ি, এইটা আমার জন্মস্থান, এরা আমার মা-বাপ, ঠাকুমা, পিসি..

আপনজন। জানে এই আমার বন্ধুরা। আমার ইস্কুল, আমার সবকিছু। হঠাৎ একদিন যদি তার প্রাণের ভালোবাসার সেই মা, যাকে সুখী করবে বলে ছেলেটা অনেক বড়ো হতে চেয়েছে, সেই মা মৃত্যুকালে বলে উঠলো, 'তুই এখানের কেউ নয়, এরা তোর কেউ নয়, আমি তোর সত্যিকার মা নয়। তোর সত্যিকার মা তোকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে গেছলো—!' ব্যস। আর কথা বললো না সেই মা। কোথায় কী ভাবে ফেলে দিয়েছিলো, তা সে জানতেও পারলো না। শুধু তারপর বুঝতে পারলো, কেন মা-বাপের একমাত্র ছেলে হয়েও তার নাম 'ফ্যালা'। কেন ওই মিথ্যে মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ তাকে তেমন সুচক্ষে দেখতো না। হ্যানস্থা করতো।··· ছেলেটা রেগে গেলে সেই মা কেমন যেন হেসে হেসে বলতো, তা তুই তো আর এদের বাড়ির ছেলে নয়, তুই তো কুড়োনো ছেলে—ছেলেটা ভাবতো ঠাট্টা। কী করে ভাববে ঠাট্টা নয়, সত্যি।···তারপর যখন—"

হঠাৎ চুপ করে যায় ফ্যালা।

তারপর একটু পরে আস্তে বলে, কখনো কাউকে বলিনি, এই প্রথম আপনাকে বললুম। তবে বলে আর কী লাভ হলো? আপনি তো বলছেন, আপনার ওসব হাত দেখা-টেখা ধাপ্পা! লোক-ঠকানো মজা!

হতাশায় ভেঙে পড়ে ফ্যালা।

গভীর গলায় বলে, অথচ বরাবর ভেবে চলেছি, "হঠাৎ একদিন ভয়ানক কিছু একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটবে, সবাই যাকে অলৌকিক বলে সেইরকম কিছু হবে আর আমার সমস্ত অন্ধকার ঘুচে যাবে। জেনে ফেলতে পেরে যাবো 'ফ্যালা' কে? কেন তার মা তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেছলো!"

গোপাল খুব মমতার গলায় বলে, আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি ভাই। তবে বলছিলাম কী, এই অজানা অতীতটাকে নিয়ে কষ্ট না পেয়ে তাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করা যায় না? নতুন জীবন নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করা যায় না?

ফ্যালা বলে, দাঁড়াবার জন্যে যেমন পায়ের তলায় একটু মাটি

দরকার হয় গোপালদা, বাঁচবার জন্যেও তেমনি একটা পরিচয় দরকার হয় না ? পৃথিবীর যে কোনোখানেই যাবে মানুষ, সব্বাই চেঁচিয়ে উঠবে, "নাম কী ? দেশ কী ? বংশ কী ? জাত-গোত্তর কী ? শেকড় কোথায় ?"...বলুন করবে কিনা ? তার জবাব কী ? বানিয়ে বানিয়ে কতো দিন চালানো যাবে ? অবশেষে সবাই বলবে 'জোচ্চোর', 'ঠগ' !...নাঃ। আমার কষ্টের কথা বোঝাবার সাধ্যি আপনার নেই গোপালদা। আপনারও তো শুনলাম মা নেই, বাবা নেই, কোথাও কেউ নেই। তবু আপনার সব আছে !

আচ্ছা ওই যেখানে তুমি মানুষ হয়েছিলে, কী 'পুরু' যেন বললে সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে না ?

কেন ? কেন ? কি জন্যে ?

হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত দেখায় ফ্যালাকে।

গোপাল অপ্রতিভভাবে বলে, না মানে যদি সেখানের পুরনো কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারে।

কে দেবে ? কে জানে ? কেউ কিছু বলতে পারবে না, শুধু হেসে হেসে ভাববে, "ওমা ! ঘোষালবাড়ির সেই কুড়নো ছেলেটা লজ্জার মাথা খেয়ে ভিখিরির মতো আবার এসেছে।" সব্বাই তো আসল কথাটা জানতো গোপালদা ! শুধু এই অবোধ আহাম্মুক নির্বুদ্ধি হতভাগাটা জানতো না। শুনেও বিশ্বাস করতো না ! কারণ সে জানতো না পৃথিবীকে অবিশ্বাস করতে হয়।

অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকার পর গোপাল বলে, আমি অবশ্য কিছুই জানি না, তবু শুনেছি এমন সব জ্ঞানীগুণী সাধক জ্যোতিষীও আছেন, যাঁরা না কী 'নষ্ট কোষ্ঠী' উদ্ধার করে দিতে পারেন।

কী ? কী উদ্ধার করে দিতে পারেন ?

ফ্যালার স্বর তীক্ষ্ন শোনায়।

'নষ্ট কোষ্ঠী'। মানে আর কী যার গণ-গোত্তর রাশি-নক্ষত্র ঠিকুজি-কোষ্ঠী কিচ্ছু জানা নেই, তার কপাল দেখে কী হাত দেখে সব বলে দিতে পারেন। নাকি ওই ঠিকুজি-কোষ্ঠী করে দিতেও পারেন।

অ্যাঁ ! ঠিক বলছেন ? কোথায় ? কোথায় সেই তাঁরা ?

আছেন হয়তো অনেকেই। তবে শুনেছি বেনারসে এরকম এমন একজন আছেন, তিনি পূর্ব পূর্ব-জন্মের কথাও বলে দিতে পারেন। 'ভৃগুর বিচার' না কী যেন বলা হয়। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? যা বলছেন, তা যে সত্যি তার প্রমাণ কোথায় মিলবে? আসলে—আমাদের বিশ্বাসের তেমন জোর কই? চারিদিকে অহরহ ভাঁওতার কারবার দেখতে দেখতে বিশ্বাসের গোড়ায় শেকড় নেই। যাঁর কাছে যতো ভক্তি নিয়েই যাই তবু মনে হয়, 'বলছেন তো! কিন্তু সত্যিই কী তাই?' তাই বলছি, অতো জানবার চেষ্টায় দরকার কী? তোমার কিছু না জেনেই তো মামা তোমাকে এতো ভালোবেসে ফেলেছে যে, জামাই করতে বাসনা—

আপনিও এই কথা বলছেন?

ফ্যালা ছিটকে ওঠে। তীক্ষ্ন গলায় বলে ওঠে, কে বলেছে আপনাকে একথা?

গোপাল বলে, রেগে যাচ্ছো কেন ভাই? অনুমান করছি, তাই বললুম! আর ওই পাগলা-ক্ষ্যাপা টুকুটা। আমার বিশ্বাস ও তোমায় সত্যিই ভালোবাসে।

'ও তোমায় সত্যিই ভালোবাসে!...ও তোমায় সত্যিই ভালোবাসে —...ও তোমাকে—'

এ আবার কী হলো ফ্যালার। তার মাথার মধ্যে অবিরত এই শব্দটা হাতুড়ি পিটে চলেছে কেন?

ফ্যালা কি তাহলে জালে পড়ে বসলো? ফ্যালার আর উদ্ধার নেই?

অ্যাঁ কী বললি? ঘোষাল-বাড়ি? তার মানে বামুন-বাড়ি?

মনোহর যেন আহ্লাদে হাঁসফাঁস করে ওঠে, "একথা স্বীকার পেয়েছে তোর কাছে? ওরে গোপ্‌লা! তুই যে আজ আমার প্রাণে কী শান্তিবারি ঢেলে দিলি বাবা। তোকে আমার ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করতে ইচ্ছে করছে।...আজ অবধি ওর কাছ থেকে ওর বিষয়ে একটা কথা আদায় করে উঠতে পারিনি। তাই ভয় হতো কী জানি কী আছে ওর অতীতে।"

মনোহর গলার স্বরটা একটু নামায়, বলে, তোর কাছে চাপবো না, মনের অগোচর তো পাপ নেই, ওর ওই কাঠকবুল ভাব দেখে মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে কু গাইতো।...ভাবতাম তবে কী খারাপ মেয়েছেলের ঘরের ছেলে? তাই কিছু বলে না।...তবে কী খুব একটা গর্হিত কিছু কাজ করে পলাতক হয়েছে, তাই কোনো পরিচয় ভাঙে না?...অথচ ওকে দেখলে সে চিন্তা লজ্জা পেতো।...তবু মনের বালাই বলে কথা! কতো সময় ভেবেছি ছেলেবয়েসে ছেলেবুদ্ধির খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতে খেলতে ঝগড়াবিবাদ করে ইঁট-পাথর ছুঁড়ে কারো মাথা ফাটিয়ে খুন করে বসে ফেরার হয়নি তো? হয়তো পুলিশের ভয়ে—তো তোর কাছে মন খুলে সব বলেছে শুনে বর্তে গেলাম রে গোপাল। আহা ছেলেটার মনের মধ্যে এতো দুঃখু ব্যথা!...ঠাকুরের কাছে বর চেয়ে মার দুঃখু ঘোচাবে বলে 'তপস্যা' করতে বসেছিল! আহা! কী সোনার ছেলে।...ভেবে দ্যাখ, যখন জানতে পারলো সেই মা ওর সত্যি মা নয়, তখন মাথা বিগড়ে গিয়ে পাগলা বনে যাবারই তো কথা।...যাক, এবার আমি নিশ্চিন্দি রে গোপ্‌লা। মনপ্রাণ খুলে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করবো!...বলি জ্ঞান থেকে দশবারোটা বছর পর্যন্ত যে ছেলে ব্রাহ্মণের ঘরে মানুষ হয়েছে, বাপ মানে যাকে বাপ বলে জেনেছে, ইস্কুলের হেডমাস্টার, সে ছেলে কিছু আর মুচি মোছলমানের ঘরের হবে না। গোপাল, তুই আমায় বাঁচালি বাবা।

আবেগে-আহ্লাদে ভাগ্নের হাতটা জড়িয়ে ধরে মনোহর। পারলে বুকেই চেপে ধরতো। অসুবিধে ঘটাচ্ছে ভুঁড়িটা।

মনোহর বলে, টুকুর বিয়েতে, 'কেটারার' করবো।

মনোহর-গিন্নী বলে, টুকুর বিয়েতে রসুনচৌকি বসাতে হবে।

মনোহর বলে, আগের মেয়েদের বেলায় তেমন আয়-উন্নতি ছিলো না, পেরে উঠিনি, ভাবছি এ জামাইকে হীরের আংটি দেব। আর সে আংটি তো ঘরেই থাকবে!

গিন্নী বলে, খবরদার, অমন কাজটি কোরো না। তাহলে ও তিনটে মেয়ে হিংসেয় বুকফেটে মরবে। যা দেব সব চুপিচুপি।

তবে ঘটাপটাটি মনের মতো করে করতে হবে। বলবো, "এই আমাদের শেষ কাজ।"

টুকুর খুব ফুর্তি হয়েছে, না টুকুর মা?

তা আবার হয়নি?...কেন আমি তো তোমায় কবেই বলেছি—ওপরে দেবুটাকে হ্যানস্থা ভাব দেখায় ঢং করে। আসলে ভেতরে খুব টান।

আচ্ছা দেবুর ভাবগতিটা কি বল তো?

চাপাস্বভাব ছেলে, চট করে বোঝা যায় না। তবে ভেতরে আছে বৈকি টান।...আসলে নিজেকে 'ছোট' ভেবে এসেছে তো চিরকাল।

সেটা ভেবে এসেছে ওর ভদ্রতায়। আচারে-আচরণে 'ছোট' নয়।

আমাদের শেষ জীবনটা সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেলো। কী বল টুকুর মা?

সে আর বলতে। এখন ঠাকুরের ইচ্ছেয় সব সুভালাভালি হয়ে যাক!...তিন মেয়ে তিন জামাই তাদের সাঙ্গোপাঙ্গর দল এসে দশ দিন থাকবে, হ্যাপাটি কম নয়। যা মেজাজ মেয়ে-জামাইদের। পান থেকে চুন খসলে চলে না।

টুকু ওদের মতো নয়।

তাই টুকুর কপালে শিবের মতো বর জুটছে!

তা টুকুও সেই আহ্লাদে যেন প্রজাপতির মতো হাওয়ায় ভাসছে।...টুকু অনায়াসে মাকে বলছে, মা দেদার তো নতুন শাড়িটাড়ি কিনছো, পুরনো ভালোগুলো সব পরে নিই। অ্যাঁ! রোজ এক একখানা পরে কলেজ যাবো।

মা হাসে। সাধে বলি পাগল। বেশী সেজেগুজে কলেজে গেলে বন্ধুরা কী বলবে!

বলবে আবার কী? কতোজনই তো খুব সেজেগুজে আসেও! এ তো আর ইস্কুল নয় যে সব্বাইকে একরকম একটা ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে?

এক-আধ দিন দেবুর চোখে পড়ে গেলে হয়তো বলে ওঠে,

আরেব্বাস ! সক্কালবেলা নেমন্তন্ন যাচ্ছো যে ? কোথায় ?

নেমন্তন্ন যাচ্ছি এ কথা কে বললো শুনি ?

তাহলে ? এতো সাজ ?

তা কী করবো ? জামা-কাপড়গুলো সব পড়ে পড়ে পচছে !

আশ্চর্য। কারোর জামাকাপড় পড়ে পচে, আবার কতোজনার পরতে একটা কাপড় জোটে না।

তোমার তো কেবল উপদেশের কথা। কেমন দেখাচ্ছে, তা একটু বলতে পারো না।

সে তো নিজেই আরশির সামনে দু'চার ঘণ্টা ধরে দেখেছ।

দু'চার ঘণ্টা ?

ওই হলো ! তার বেশীও হতে পারে।

টুকু একটু অপরূপ মুখভঙ্গী করে বলে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার কপালে কী আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে টুকু, সোনালী আঁচল উড়িয়ে। দেবু কী কারণে দোতলায় উঠতে গিয়ে দু সিঁড়ি উঠে পিছিয়ে নেমে আসে।

টুকু ঝলসে ওঠে মুখঝামটা দেয়, তুমি এমন ভাব করো, যেন আমি একটা ছোঁয়াচে রোগের রুগী। তাই ছোঁয়াচ বাঁচাতে তৎপর।

তোমার সবই মনগড়া। তোমার সুবিধের জন্যেই পথ ছেড়ে দিই।

সুবিধের জন্যে পথ ছাড়া। আহা, কী বুদ্ধি, আচ্ছা ! পরে এর কী শোধ নেবো তা দেখো।

বলে এইরকমই।

অথচ এখনো পর্যন্ত ফ্যালাকে কেউ সেভাবে প্রস্তাব দেয়নি।

মনোহর ভেবে চলেছে, "এক্ষুণি বলে ফেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়ে কাজ নেই। কে জানে—বিচার-বিবেচনা করতে বেশী সময় পেলে উল্টো উৎপত্তি হবে কিনা !···আঁচে-ইঙ্গিতে টের তো পাচ্ছে। কই কিছু তো মাথানাড়া দিচ্ছে না।

অতএব বোতাম আংটি গড়াতে দেওয়া হয়, মেয়ের গহনা গড়ানো সমাপ্তি হয়।

কিন্তু ফ্যালা ?

ফ্যালা কী এখনো তেমনি অবোধ আছে ?

যখন পবন ঘোষাল বলতো 'ভেস্ন ঝাড়ের তেউড় বাঁশ,' অথচ তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে উঠতে পারত না ফ্যালা! বোঝবার জন্যে মাথাও ঘামাতো না।

এখন যে 'টুকু' নামের মেয়েটা যখন তখন অপরূপ ভঙ্গী করে বলে, 'আমার কপালে যে কী আছে, তা দিব্যদৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছি।' তাও কী তাহলে বুঝতে পারে না ফ্যালা? তাই, না বোঝবার চেষ্টাও করে না।

না কী ফ্যালা এখন নিজেকে ঘটনাচক্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছে? ভাবছে দেখে যাবে শেষ পর্যন্ত! যা হচ্ছে হোক!

কিন্তু তবু ফ্যালা বরাবর ভাবে এবং বিশ্বাস করে, হঠাৎ একদিন ফ্যালার জীবনে হয়তো ভয়ানক আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে যাবে। ফ্যালার-চোখের সামনে থেকে নিবিড় অন্ধকার কেটে যাবে। ফ্যালা আলোয় নেয়ে দাঁড়াবে!···হবে। হবে! কিছু একটা হবে।

অলৌকিকের মতো কিছু।

অসম্ভব মতো কিছু।

তা তাই কী হলো না?···তাই তো হলো।

আর সেটা এলো 'মোগলসরাই' নামের একটা জায়গা থেকে, একখানা চিঠির রূপে।

চিঠিখানা আসামাত্রই খাম খুলে পড়তে পড়তে বাইরের ঘর থেকে ভিতরের দালানে চলে এলো মনোহর।

টুকু বাড়ি নেই। এক সহপাঠিনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন গেছে। টুকুর মা চা ঢালছে। এটা সান্ধ্য চা! দোকান বন্ধ করে ফিরেছে মনোহর তার সেলসম্যানকে নিয়ে।

মনোহর গৃহিণীর দিকে চোখ তুলে বললেন, "এই দ্যাখো কাণ্ড তোমার বাবার। যাকে বলে, 'মরণকালে জ্বরছেদ'!"

মনোহর-প্রিয়া মনোহর ভঙ্গীতেই বলে, কেন? হঠাৎ কী হলো? হঠাৎ আমার বাবার কথা তোলা হচ্ছে কোন সুবাদে?

আছে। আছে সুবাদ!···ভদ্দরলোক তো তাঁর 'দ্বিতীয় পক্ষটি' আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে নিয়ে সুখেই সংসার করছিলেন, প্রথম

পক্ষের যে একটা মেয়ে আছে, আজ পঁচিশ ছাব্বিশ বচ্ছরের মধ্যে তো মনেও পড়েনি। হঠাৎ এখন মৃত্যুকাল এসেছে দেখে, সেই ভুলে যাওয়া মেয়েকে নাকি একবার দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফটাচ্ছে।...এই যে লিখেছেন, "তাহার মুখটি একবার না দেখিতে পাইলে, মরিয়াও শান্তি নাই আমার। অতএব বাবাজীবন, তুমি অতি অবশ্য করিয়া তরুকে অন্তত একবারের জন্যও লইয়া আসিবে। যদি কার্যব্যপদেশে নিজে লইয়া আসিতে না পারো, যে কোনো প্রকারে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। আমার মাথার দিব্য!"...হা হা হা! 'তরু' নামটা এখনো মনে আছে বুড়ো ভদ্দরলোকের?

মনোহর হেসে উঠলেও 'তরু' হাসে না। বেজারভাবে বলে, ওভাবে হাসছো যে? যতই হোক, গুরুজন নয় তোমার?

আহা, তা নয়, সেকথা কী বলছি? বলছি এতোকালে কখনো তো খোঁজও নেননি। প্রথম প্রথম তুমি তো বিজয়া দশমীতে প্রণামীপত্তর পাঠিয়েছো—কখনো তার উত্তর এসেছে?

'তরু' বা তরুবালা, বা তরঙ্গিণী যাই হোক, বলে, সে হয়তো অন্য ব্যাপারও হতে পারে! হয়তো নতুন মা আমার চিঠি গাপ করে ফেলেছে, দেখতেই দেয়নি!

তা সে যাই হোক, মৃত্যুকাল আসন্ন দেখে এখন তোমার বাবা—

'আমার বাবা আমার বাবা' করছো কেন শুনি? তোমার কেউ নয়?

'নয়' তা আর বলি কী করে? তবে এযাবত তো—সে যাক। এখন যে উনি তোমায় দেখার জন্যে এতো উতলা হলেন কেন তাই ভাবছি।

ফ্যালা চা খেতে খেতে হঠাৎ হেসে বলে ওঠে, বোধহয় স্বর্গে গিয়ে সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি যদি তাঁর মেয়ের খবর চান, তাহলে কী জবাব দেবেন, সেই ভেবেই।

মনোহর হা হা করে হেসে ওঠে।

তরঙ্গিণী বিরক্ত হয়ে বলে, একটা মানুষের মৃত্যু আসন্ন শুনেও এতো হাসির কী আছে বুঝি না। নাও গোড়া থেকে সবটা ভালো করে পড়ো দিকি আর একবার।

অতএব মনোহর পড়তে থাকে, "পরম কল্যাণীয় নিরাপদ দীর্ঘ-জীবতেষু স্নেহের বাবাজীবন—"

কিন্তু এ চিঠির সঙ্গে ফ্যালার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতে যাবে কেন? ফ্যালার চিরদিনের ধারণা, "হঠাৎ একদিন হয়তো ভয়ানক আশ্চর্য কিছু একটা ঘটে গিয়ে—"

সে ধারণার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?

ছিলো সম্পর্ক।

অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা ফ্যালার জীবনের ঘুড়িটা, যা নাকি লটকে পড়ে একটা বেমক্কা জায়গায় আটকে ছিলো, সে হঠাৎ ওই চিঠিখানা বাহিত হয়ে আসা একটা অনুকূল বাতাসের টানে যেন লাটাই থেকে পাক খুলে সরসরিয়ে ছুটতে থাকে, শনশনিয়ে আকাশের কোলে পেঁাছে যায়।

চিঠিখানা যেখান থেকে এসেছে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে মোগল-সরাই। যা নাকি কাশীধামের আগের স্টেশন। আর কাশীধাম-এর অপর নামই তো 'বেনারস'।

সেই বেনারস!

গোপাল সরকার যার নাম উল্লেখ করে বলেছিলো, "শুনেছি না কী বেনারসে এক জ্ঞানীগুণী সাধক জ্যোতিষী আছেন, যিনি কপাল দেখে, হাত দেখে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করে দিতে পারেন।"

নষ্ট কোষ্ঠী!

জীবনে এই প্রথম এই শব্দটা শুনেছিল ফ্যালা।

অথচ এখন ফ্যালা সজাগ চেতনা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে শিখে কতো কতো জায়গায় ওই শব্দটা দেখছে, পড়ছে। পঞ্জিকার পাতায় পাতায় হাজারো জ্যোতিষীর নামধাম গুণবর্ণনার সঙ্গে অনেকের গুণবিবরণ-মালার মধ্যে কথাটা দেখা যায়। দেখেও ফ্যালা। কিন্তু ফ্যালা তো তেমন স্পন্দিত চিত্তে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যেতে পারে না! গোপালদার মতে বেশীর ভাগই নাকি ব্যবসাদার। জ্যোতিষচর্চাকে পেশা করে নিয়েছে।

তাহলে?

ফ্যালা কোন বুদ্ধিবলে তাদের মধ্যে থেকে 'আসল গুণী' কে

চিনে নিতে পারবে ?···খড়ের বস্তার মধ্যে থেকে ছুঁচ খুঁজে বার করতে পারবার মতো আলোকিত দৃষ্টি কী আছে ফ্যালার ?

ভরসা শুধু ওই 'বেনারস'।

নামটা শুনে পর্যন্তই ফ্যালার মন উত্তাল হয়ে উঠেছে। তবে বুঝি ফ্যালার জীবনে সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চলেছে ?

টুকুর মায়ের 'বিস্মরণ বাবা' হঠাৎ যদি তাঁর মেয়েকে স্মরণ করেই থাকেন, এবং সে জায়গাটা যদি 'কাশীধাম' নামের মহাতীর্থের কাছাকাছি হয়ও, ফ্যালা সেই মঞ্চে আসে কোথা থেকে ?

ঘটনাচক্রের মজা তো সেইখানেই। নিয়তি যে কাকে কোনখান থেকে কোন অদৃশ্য সূত্রে টান মারে।···

মনোহর বলে উঠেছিলো, আমি ? আমি এখন এই মোক্ষম সময় দোকান ফেলে কোথায় যাবো ? বছর কাবারের সময়, সালতামামির হিসেব নিকেশ, 'সেল'-এর মরসুম—

মনোহরের গিন্নী অবশ্যই ছিটকে উঠেছিলো, বলেছিলো, "চিরকালই তো তোমার মোক্ষম সময়। কবে আমায় নিয়ে কোথাও দু'পা বেরিয়েছো ? 'জন্মদাতা পিতা' মরণকালে স্মরণ করেছেন, অথচ—"

কান্নার আবেগে কথা শেষ হয়নি।

ফ্যালা অবাক হয়ে দেখেছিলো সেই আবেগ !

'জন্মদাতা পিতার' জন্যে তাহলে থাকে এই আবেগ ? ছাব্বিশ বছর দেখাসাক্ষাৎ না হলেও ?

কী আশ্চর্য ! কী অদ্ভুত !

আচ্ছা 'ভুবন ঘোষাল' নামের লোকটা কী হঠাৎ তার মৃত্যুকাল এসে গেলে ফ্যালাকে দেখতে চাইবে ?

মনোহরের আপোস, তবে এক কাজ করা যাক—নতুন ছেলেটাকে নিয়ে আমি গোটা তিন-চার দিন চালিয়ে নেবো, দেবু তোমায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসুক।

ওঃ গোটা তিন-চার দিন ? এতোকাল পরে যাচ্ছি—গিয়ে কী অবস্থা দেখবো তার ঠিক নেই—

কিন্তু টুকুকে ফেলে রেখে কতোদিনই বা স্বস্তি হয়ে থাকতে পারবে তরু ?

ফেলে রেখে মানে ? ওকে রেখে একদিনও অন্যত্র কাটাতে পারে টুকুর মা ? ওকে তো সঙ্গে নিয়েই যাবে ! ছুটি রয়েছে।

টুকু প্রথমে বেঁকে বসে, আমি বাবা কোথাও যেতে-টেতে পারবো না। যে দাদামশাইকে জীবনে চাক্ষুষ দেখেনি তার বাড়িতে—

নাই বা দেখলি। তবু আপনজন তো বটে। রক্তের সম্পর্ক তো !

অনেক আপত্তি, নানা যুক্তি, শেষ পর্যন্ত রাজী।

হয়তো বা 'সঙ্গী' হিসেবে দেবু যাচ্ছে শুনে।

কিন্তু তরঙ্গিণীর পূজনীয় পিতাঠাকুর যদি মেয়েকে দশ-বিশ দিন থাকতে বলেন ? অথবা যদি সেটেই যান ?···দেবু অতোদিন একটা অচেনা অজানা বাড়িতে বসে থাকবে ? তারাই বা কী স্বস্তি পাবে ? ···তরঙ্গিণীর সেই প্রায় অচেনা 'ছোটমা'ই বা সেটি কোন আহ্লাদভরে মেনে নেবেন ?

এটা অবশ্যই একটা সমস্যা।

অতঃপর চিরকালের স্থিরবুদ্ধি মনোহর বিশ্বাস সমস্যার সমাধান করে ফেলে। দেবু পেঁছে দিয়েই চলে আসবে, এবং ফিরে এসে দোকানটার হাল ধরবে, মনোহর অবস্থা অনুযায়ী একবার গিয়ে স্ত্রী-কন্যেকে নিয়ে আসবে।

আর এই 'ব্যবস্থাপত্র'টি লেখার সময় মনোহর বলে ওঠে, তাহলে এক কাজ কোরো বাবা দেবু। কাশী হেন মহাতীর্থ, অতো কাছে যখন যাচ্ছোই, একবার বিশ্বনাথ 'অন্নপূর্ণা দর্শন করে এসো।

'বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা'।

হ্যাঁ। জগতের সকলের পিতামাতা। এতো সুযোগ যখন এসে গেছে—

গিন্নীর কান বাঁচিয়েই বলে। তার বাপ মরাটা যে অন্য কারো 'সুযোগের' ঘরে অঙ্ক বসাবে এটা শুনলে ক্ষেপে যাবে না ?

দেবু সঙ্গে যাবে টুকু পুলকিত আলোড়িত। আর টুকুর মা নিশ্চিন্ত।

দরকার মতো টাকাপত্র দিয়েও মনোহর বেশ কিছু টাকা দেবুর হাতে জোর করে গুঁজে দেন দেন 'কাশী বেড়িয়ে আসবে' বলে। আরে বাবা, শুধুই কী ওখানে এককোটি শিব? দু'চার কোটি দোকানও। কতো দেখবার কতো কেনবার। ইচ্ছেমতো খরচ করবে।

আর এ টাকা তো দেবুর নিজেরই। তার প্রাপ্য টাকা সে কী কখনো নিয়েছে? তাছাড়া—মনোহর একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলেছিলো, এর পর তো আমার যা কিছু সবই তোমার হবে বাবা!

কিছুদিন থেকে আর মনোহর 'দেবু, তুই' বলছে না। শুধু 'তুমিটা শুনতে নীরস হবে বলে, সবসময় কথার শেষে একটা 'বাবা' যোগ করে।

দেবু অবশ্য 'এতো টাকা কী হবে?' বলেছিল, মনোহর ছাড়েনি। বলেছিল, "ঠিক আছে, খরচা না হয় ফিরে এসে ফিরিয়ে দিয়ো।"

কিন্তু তারপর?,

ফিরে গিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থটা কি ফেরত দিয়েছিলো দেবু তার মনিব অথবা পালককে?

বিশ্বাসহন্তা 'দেবীচরণ' কী তার জীবনের সব অর্থই অপহরণ করে বসে তাকে বানচাল করে দেয়নি?

তা এক হিসেবে তাকে তো বিশ্বাসহন্তাই বলতে হল।

টুকু বলেছিলো, "মা, আমিও দেবুর সঙ্গে বেনারস যাই না? ফেরার সময় তো এই মোগলসরাইতে আসতেই হবে—"

মা চাপা গলায় ছিঃ দিয়েছিলো। "ছিঃ এসেই হাওয়া হয়ে যাবি। দিদিমা দাদামশাই কী বলবে? তা ছাড়া ও কে, কী বিত্তান্ত সাতসতেরো জবাবদিহি।...তোর বাবা যখন আমাদের নিতে আসবে, আমরা তিনজন একবার বিশ্বনাথ দর্শন না করেই ফিরবো? সাতজন্মে বেরোনো হয় না। এতো কাছে এসে—"

যেন 'বিশ্বনাথ দর্শনের' জন্যেই মরে যাচ্ছিলো টুকু।

যাত্রাকালে টুকু তার বড়ো বড়ো চোখে সেই তার স্পেশাল চাহনিটি চেয়ে বলেছিলো, মা তো আমায় তোমার সঙ্গে যেতে দিলো না। কতোদিনে আবার দেখা হবে কে জানে! এইসময়ই ছাই আমার

ছুটি পড়লো। বাপের বাড়ি এসে তো দেখছি মা বিশ্ব ভুলে গেছে। তুমি আবার একা স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের ভুলেটুলে যাবে না তো ?

ফ্যালা আলগা অন্যমনস্কভাবে বলেছিলো, কী যে বলো টুকু !

অন্যমনস্কই তো হয়ে আছে ফ্যালা। চারিদিকের সমগ্র বন্ধন থেকে যেন আলগা হয়ে গেছে।

ফ্যালা তো আর বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে—নিজেকে খুঁজে পেতে।···সেই খুঁজে পাবার পর, কী সে এই 'ফ্যালা' বা এই 'দেবু'ই থাকবে ?

এর উত্তর তো 'দেবু'র নিজেরই জানা নেই।

একবার শুধু সেই বেনারসে গিয়ে পড়া। ওখানে যখন সেই একজনই 'মহান জন' আছেন, যিনি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করতে পারেন, নিশ্চয়ই দেশসুদ্ধ সবাই তাঁকে মানে। যেমন কোনো একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারের নাম সব্বাই জানে। তাহলেই পেয়ে যাবে ফ্যালা তাঁর ঠিকানা।

ফ্যালা তাই শুধু আলগাভাবে বলেছিলো, "কী যে বলো টুকু।"

এরপর ফ্যালা কাশীধামের রাস্তায় অসংখ্য মানুষ আর যানবাহন আর অবাধ বিচরণশীল ষাঁড়েদের ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেলো, মিলিয়ে গেলো।

ক্রমশ আর তাকে দেবু বলেও চেনা যাচ্ছে না ফ্যালা বলেও চেনা যাচ্ছে না। একটা ধূলিধূসরিত উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার ছেলেকে কেবল একে-ওকে তাকে জিগ্যেস করতে দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা সেই তিনি কোথায় থাকেন ? যিনি শুধু কপাল দেখে আর হাত দেখে 'নষ্ট কোষ্ঠী' উদ্ধার করে দিতে পারেন ?

অনেকেই গ্রাহ্য করে না, জবাব দেয় না, আবার অনেক যা হোক একটা নামধাম বলে দেয়, খুঁজে খুঁজে যদি বা হদিস মেলে কোনো একজনের-তো ফ্যালার চাহিদার সঙ্গে মেলে না।

সেই অনেকগুলো টাকা তো কবেই ফুরিয়ে গেছে, তবু টিকেও আছে ফ্যালা, যেমন টিকেছিলো ময়নাপুর থেকে ছিটকে বেরিয়ে

এসে। ফ্যালার আর এখন মনে পড়ে না, সে কতোদিন এ-ভাবে ঘুরছে। অথচ—নেশা লেগে গেছে। নিত্য সকাল সন্ধ্যা গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়ায়।

কতো জায়গায় কতো কথকের আসর বসে, কতো সাধু-সন্তর উপদেশের আসর বসে, ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত সেই সব জনেদের ধারে-কাছে গিয়ে বসে ফ্যালা, কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না। কই, এদের মধ্যে কেউ তো জিগ্যেস করছে না, আচ্ছা ঠাকুর, বলে দিন তো 'আমি কে'!

সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, গঙ্গার ধারে ভিড়ভাট্টা কমে আসে। ফ্যালা গঙ্গার স্রোতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে। মনে পড়ে না কেন বসে আছে।

ঘাট বদলাতে বদলাতে ফ্যালা এখন মণিকর্ণিকার ঘাটের ধারে এসে বসে।

এতো চিতা জ্বলে?

এতো মানুষ মরে?

এইখানে দাহ করলে নাকি তার আর জন্ম হয় না। কিন্তু তাতে কী লাভ হলো? আবার জন্মালেই তো এই পৃথিবীটাকে আবার দেখতে পাবে।

এই শ্মশানের ধারেপাশে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখতে পায় ফ্যালা, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না। দেখলে ভয় করে।

কিন্তু ফ্যালা যদি সেই আসল মানুষটাকে খুঁজেও পায়, আর নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে-যাওয়া নিজেকে খুঁজে পেয়ে যায়, তাকে নিয়ে কী করবে ফ্যালা? তাকে কোথায় প্রতিষ্ঠা করবে? ভাবতেই থাকে। এমনি একদিন ভাবতে ভাবতে—হঠাৎ এক সময় ফ্যালার চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে যায়। আস তার সামনে সিনেমার ছবির মতো কতো ছবি আসা যাওয়া করতে থাকে।...ময়নাপুরের ঘোষালবাড়ির উঠোন, পবন ঘোষাল নামের লোকটা নিমের ডাল দাঁতে কাটতে কাটতে উঠোনময় থুতু ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে।...

'দ্বারকেশ্বর স্মৃতি বিদ্যালয়'-এর মাস্টারমশাই ভুবন ঘোষাল,

ছাতা মাথায় দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছেন।…"ময়নাপুর তরুণ সংঘ" পাঠাগারের সামনের মাঠে নিমাইদা বক্তৃতা দিচ্ছে—'আমাদের আজ জাগতে হবে, ভাবতে হবে অনেক কিছু করতে হবে।'… মুখুজ্যেবাড়ির ঠাকুরদালানের সামনে বেঁধে রাখা কচি কচি ছাগল ছানাগুলো 'ব্যা ব্যা' করে কাতর আর্তনাদ করছে। মনে হচ্ছে যেন ডেকে ডেকে বলছে, 'মা'! 'মা'!…যেন মায়ের কাছে কিছু নালিশ জানাতে চায়।

কারা একটা মাটির সরায় কাটা ফল আর বোঁদে দিলো। ফ্যালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুট দিলো।…

ফ্যালা…'মহালক্ষ্মী বস্ত্রালয়ের' কাউন্টারে বসে মালিকের সঙ্গে কথা বলছে…খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছে…ফ্যালা কাদের যেন মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।…ফ্যালা রেলগাড়ি চেপে চলছে।… সঙ্গে কে ওরা? এ সেই টুকু নামের মেয়েটা। কী রকম করে যেন বারবার…।

আর কিছু দেখতে পায় না।

ছায়াছবির স্ক্রীনটা অন্ধকার হয়ে যায়।

যখন আবার আলোর আভাস এলো, ফ্যালা দেখতে পেলো, ফ্যালা একটা মন্দিরের চাতালে শুয়ে আছে। মাথার কাছে একজন বসে। …কে ইনি? কে? কে? এঁকেই কী এতোদিন ধরে খুঁজছিলো ফ্যালা?

কী প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ! কী সৌম্য শান্ত চেহারা।

মন্দিরের পূজারী না কী?

সাধুদের মতো গেরুয়া পরা তো নয়। জটাজুট দাড়িটাড়ি কিছুই নয়। ভাষা অবাংলা নয়, যেন খুব সাধারণ এক বৃদ্ধ মাত্র। তবু যেন সর্বাঙ্গে আলোর আভাস!

খুব নরম গলায় বললেন, কী বাবা! এখন একটু আরাম পাচ্ছো?

তারপর?

তারপর ফ্যালা তার এই দীর্ঘদিনের প্রশ্নটা নিয়ে ধরে পড়লো! আমি বুঝতে পারছি গোপালদা যাঁর কথা বলেছিলো, আপনিই

সেই। একটা কথা জানতে না পারার জন্যে আমার বড় কষ্ট, সেইটা জানতে চাই বলে দিতে হবে। কতোদিন ধরে যে এই জিগ্যেসাটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলেন, কী কথা জানতে চাও বাবা? জবাব জানা থাকলে বলে দেবো।

ফ্যালা বলে ওঠে, বলে দিন 'আমি কে'?

অ্যাঁ। 'তুমি কে'? এই জিগ্যেসা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো তুমি?...

সুন্দর একটি হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

বলেন, এ প্রশ্নের তোমায় কী উত্তর দেবো বাবা? আমিও তো জানি না আমি কে? নিজেই সেই প্রশ্ন নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ফ্যালা কাতরভাবে হলেও হঠাৎ যেন ফুঁসে ওঠে। বলে ওঠে, ওঃ, বলবেন না তাই বলুন! ভাগাবার তাল!...জানেন আমার কী যন্ত্রণা!... জ্ঞান থেকে যাকে মা বলে জেনেছি, তিনি হঠাৎ মরণকালে বলে উঠলেন আমি 'তোর মা নই। তোর সত্যিকার মা তোকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে গেছে।' আপনি কপাল দেখে সব বলে দিতে পারেন, আমার মন বলছে। একবার বলে দিন—কে আমার সত্যিকার মা।...কেন তিনি আমাকে আর একজনের কোলে ফেলে দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন। বলতেই হবে! আপনি 'নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার' না কী তাই পারেন। নিশ্চয় পারেন।

বৃদ্ধ শান্ত গলায় বলে, ভুল করেছ বাবা, আমি কিছুই পারি না। আমরা কেউই কিছুই বলতে পারি না! আমরা সবাই 'নষ্ট কোষ্ঠীর' শূন্যতা নিয়ে ঘুরে বেড়াই।...আমাদের সত্যিকার মা দেখা দেয় না, ধরা দেয় না! জানি না কী উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অতি অজ্ঞান অবোধ অবস্থায় কোনো এক নারীর কোলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যান!...আমরা সেই মাকেই 'সত্যি মা' বলে নিশ্চিন্তে থাকি। ক'জন আর 'সত্যি মা'কে খুঁজে বেড়ায়, আর কজনইবা সেই খোঁজায় সফল হয়? কোটি শত কোটির মধ্যে হয়তো কদাচ কোনোকালে একজন। আমরা কেউই জানি না কোথা থেকে এসেছি, আর—আবার কোথায় যাবো। যেটা আমাদের আসল ঠিকানা,.

সেটাই আমাদের অজানা।···সকলেই আমরা যেন একটা ধর্মশালায় এসে জড়ো হয়েছি—কিছুদিনের জন্যে।

ফ্যালা তাকিয়ে দেখে মনে মনে ভাবে, তবে কী ইনি তিনি নন? গোপালদা যাঁর কথা বলেছিলো।···তবে কেন এনাকে দেখেই আমার মনপ্রাণ বলে উঠেছিলো, "ইনিই বোধহয় তিনি। ···এনার চেহারায় যেন ঠাকুরদেবতার মতো জ্যোতির ভাব। কথা কী মিষ্টি, কী স্নেহমমতা।"···ফ্যালা তো মরতেই বসেছিলো। অজ্ঞান হয়ে লটকে পড়েছিলো। ইনিই না যত্নআত্তি করে আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে প্রাণটা রক্ষে করলেন।···কিন্তু প্রাণটা রক্ষেয় লাভটা কী, যদি না জানতে পারলুম, এই প্রাণটা সৃষ্টি করেছিলো কে? মা তো একটা থাকতেই হবে। বাবাও একজন থাকবেই।—উনি আমাকে তখন বললেন' "দশাশ্বমেধের ওখানে 'অনাথ আশ্রম' দেখলে তো? ওই অতো ছেলেমেয়ের কেউ জানে না তাদের মা-বাপ আত্মীয়জন কেউ কোথাও আছে কিনা।"···ওদের সঙ্গে কী আমার অবস্থা এক হোলো? ওরা তো জ্ঞান থেকেই শূন্যে ভেসে আছে। ওই শূন্যটাই ওদের জীবন। তাই অতো বেশী কষ্ট নেই। কিন্তু ফ্যালা? ফ্যালা তার জীবনের এগারোটা বছর ধরে যাকে 'নিপাট সত্যি' বলে জেনে ভরাট ছিলো, সেটা হঠাৎ গ্যাস বেলুনের মতো ফুট হয়ে গেলো। এ কষ্টের তুলনা আছে?

ফ্যালার শরীরে এখন বল শক্তির অভাব। তবু যুবক ফ্যালা সেই বালক ফ্যালার মতোই ছিটকে উঠে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ আর প্রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, তার মানে এইভাবেই জীবন কাটাবে আমার? কোনোদিনই আমার হদিস জানাবো না! সেই অন্ধকারেই থেকে যাবো? এতো আকুলতা করেও কোনোদিনই জানতে পারবো না, কে আমার মা-বাপ? কী আমার পরিচয়? কী আমার জাতগোত্তর, নাম, বংশ! পানাপুকুরের পানার মতো শুধু ভেসে ভেসে বেড়াবো!—একটা মানুষের পায়ের তলায় একটু মাটির দরকার নেই!

পায়ের তলায় মাটি!

বৃদ্ধের মুখে সূক্ষ্ম রহস্যময় একটু হাসি ফুটে ওঠে। ফ্যালার পিঠে একটু হাত ছুঁইয়ে স্নিগ্ধ গলায় বলেন, তা ঠিক! পায়ের

তলায় একটু মাটির দরকার !—কিন্তু সে মাটি তো কেউ হাতে তুলে দেব না বাবা ! কেউ দানপত্র করেও দেবে না। নিজেই যোগাড় করে নিতে হবে।—তেমন তীব্র ব্যাকুলতা থাকলে হয়তো যোগাড় করে উঠতে পারবে।

ফ্যালা একটু গুম হয়ে বসে থাকে।

তারপর হতাশ গলায় বলে, আশা করে এসেছিলুম পেয়ে যাবো। এখানেই সেই জিনিস পেয়ে যাবো। এতোদিন ধরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছি।···তবে ছাড়বো না। একটা হেস্তনেস্ত না দেখে ছাড়বো না ! আমাকে জানতেই হবে 'আমি কে ?'

এই মন্দিরের আশ্রয় ত্যাগ করে ফ্যালা।

ত্যাগ করে এই স্নেহময় বৃদ্ধের স্নেহের 'আশ্রয়'টিও।

খুব মন কেমন করছে, চলে যাবার সময় ওঁর দিকে তাকাতে পারেনি। দূর থেকে প্রণাম রেখে পালিয়ে এসেছে নিষ্ঠুরের মতো।

তা ফ্যালা তো নিষ্ঠুরই।···ফ্যালা আরো একটা পরম স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে চলে আসেনি ? চলে আসেনি একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের হৃদয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

কিন্তু সেই আসাটার যে ভীষণ দরকার ছিলো। চিরকাল তো ফ্যালা একটা অন্ধকারের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারে না।···আবার একটা আলোয় ভাসা জীবনকে নিজের অন্ধকার জীবনের সঙ্গে জুড়তে পারে না।

ফ্যালা একবার নিজেকে জেনে নিয়ে বোঝাহীন হালকা আর আলোর জীবন নিয়ে ফিরে দেখিয়ে দেবে ফ্যালার প্রাণে মমতা আছে কিনা।···

তবে তখন পরিচয় জেনে ফেলার পর ফ্যালা কীরকম দেখতে হবে ? সেটা তো জানা নেই ফ্যালার।

তবু ফ্যালা নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ে।

তারপর···তারপর থেকে ফ্যালাকে কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেখা যায় না।

কখনো দেখা যায় সমুদ্রের কোলে, কখনো বা পাহাড়-চূড়ায়।··· কখনো রুক্ষ বালুর পথে পথে, কখনো কোনো মঠে মন্দিরে। আর

নয়তো চির স্নেহময়ী গঙ্গার তীরে তীরে।...কখনো বা জঙ্গলে অরণ্যে পথে-প্রান্তরে। সেই 'পরশপাথর' খুঁজে বেড়ানো ক্ষ্যাপাটার মতো।

তা সেইমতোই একটা নামকরণ হয়েছে তার। এখানে ওখানে এ ও সে তার নাম দিয়েছে—'ক্ষ্যাপাবাবা'।

"ক্ষ্যাপাবাবা"।

তা আদি অন্তকাল তো এই হয়ে থাকে।

লোকে যখন কারো লক্ষ্যবস্তুর হদিস খুঁজে পায় না, তখন তাকে বলে 'পাগলা, ক্ষ্যাপা'।

একটা কিছু বলে তো চিহ্নিত করতে হবে।

এখন তো আর তাকে 'দেবীচরণ' বা 'দেবু' বলে চেনা যায় না, 'ফ্যালা' বলেও নয়। অতএব ওই চিরকালীন ব্যবস্থা।

তবে দেখলে বুঝতে পারা যায়, পায়ের তলায় একটু মাটি এখনো খুঁজে পায় নি সে।

কিন্তু খুঁজে বার না করে তো ছাড়বে না ফ্যালা। বরাবরের জেদী যে।

হয়তো কোনো একদিন সন্ধান পেয়ে যাবে সে 'কে'? কী তার পরিচয়। কে তার সত্যিকার মা!

যে যন্ত্রণা তাকে বরাবর কুরে কুরে খেয়েছে, এমন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে।

তখন কী আর তার মনে পড়বে কোথায় যেন তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে 'পথ-চাওয়া দুটি চোখ, যত্নে গাঁথা একটি মালা'।